১৩০৮ বঙ্গাব্দে

নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

৩১শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা

ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৩৯

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন।

বিনীত নিবেদন

বর্ত্তমানে দেশে দারুণ অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত। ছোট বড় সকলকেই কিছু না কিছু এজন্য ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। "ভক্তি" পত্রিকার গ্রাহকবর্গের মধ্যে অনেকেই এই কারণে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভক্তির মূল্য পাঠাইতে পারিতেছেন না ইহা আমরা বুঝিতেছি; তথাপি তাঁহাদের প্রদত্ত ভক্তির বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড়টী টাকাই যে, এই ভক্তি-প্রকাশেদ্বারা ধর্ম্ম-প্রচারের ও একটী প্রাচীন বৈষ্ণব পত্রিকার জীবন রক্ষার প্রধান সহায় তাহা আমরা ভুলিতে পারি না। তাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, এখনও যাহারা বার্ষিক মূল্য পাঠান নাই একটু চেষ্টা করিয়া এই সময় উহা পাঠাইয়া আমাদিগের কার্য্যে সহায়তা করুন। ডাক মাশুল বৃদ্ধি হেতু অন্যান্য বারের ন্যায় প্রত্যেককে পৃথক পৃথক অনুরোধ পত্র পাঠাইতে পারিলাম না, সাধারণ ভাবে এই নিবেদন জানাইলাম।

বিনীত—কার্য্যাধ্যক্ষ "ভক্তি"

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা।

নমুনা প্রতি খণ্ড ৵০ তিন আনা, ভিঃ পিতে ৵৹০ আনা

ভক্তি-সম্পাদক—

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন সম্পাদিত

সূচীপত্র

সম্পাদক কর্ত্তৃক মাসিক "ভক্তি-নিকেতন" পোঃ আন্দুল-মৌড়ী হাওড়া হইতে প্রকাশিত
ও কলিকাতা ৭৭নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

৩১শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা | ভক্তি
ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা | ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৩৯

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে

(বালক সঙ্কীর্ত্তন)

(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস, কবিকণ্ঠ, কাব্যগুণাকর।)

আয়রে ভাই, আয়রে সবাই,
হেরবি যদি চাঁদের মেলা।
নন্দরাণীর হৃদি আকাশে
ভাস্‌ছে আজি চাঁদের ভেলা॥
নয়রে সে আকাশের চাঁদ,
চাঁদ বিজয়ী সে কালাচাঁদ,
চল ছুটে সে চাঁদের পাশে,
চাঁদসনে ভাই করব খেলা॥
চাঁদ হবে ভাই খেলার সাথী,
ধরব বুকে দিবা-রাতি,
প্রাণ জুড়াবে হৃদি পরশি,
প্রিয় চাঁদের হাসির মালা॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মবৃত্তান্ত।*

(শ্রীশ্রীমৎ অব্যক্তানন্দ স্বামী।)

যখন স্বর্ণপ্রসবিনী, বীরজননী, শ্রীভগবানের চিরন্তন লীলাভূমি ধরিত্রী মাতা পাপভারে ভারাক্রান্তা; যখন দুর্ব্বল সবলের অত্যাচারে উদ্ব্যস্ত; যখন শান্তস্বভাব, ভগবন্নিরত ধর্ম্মাত্মা পুরুষগণ দুষ্টস্বভাব মন্দমতি, অসদ্বৃত্তিমাত্রৈক সহায়, ঘোর স্বার্থপরায়ণ, দাম্ভিক, উদ্ধত প্রকৃতি, আসুর ভাবাপন্ন দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক সদা উৎপীড়িত হইয়া থাকেন; যখন ধরণী বেদ-বিহিত সনাতন ন্যায় এবং ধর্ম্মের পূত সংসর্গ হইতে বঞ্চিতা, শিশ্নোদর পরায়ণ, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র, ভোগমাত্রৈকজীবী নরাকার পশুগণ দ্বারা পরিপূর্ণ, —এক কথায়, যখন দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্গুণনিচয় জগৎ সংসার হইতে লোপ পাইতে থাকে, পাপের প্রবল বন্যায় যখন অবনীতল কর্ণধারহীন পোতের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া, বিনাশের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে, তখন ইহাকে তথাকথিত সমূহ বিপজ্জাল হইতে মুক্ত করিয়া, সমস্ত পরপীড়ক পাপাত্মাগণের দুর্নিবার্য্য করাল কবল হইতে শান্তস্বভাব, নিরীহ, মৈত্রীগুণসম্পন্ন সজ্জনবৃন্দের রক্ষা সাধন নিমিত্ত, পরমকারুণিক সদা মঙ্গলময়, পরমপুরুষ শ্রীভগবান্ ন্যায় ও ধর্ম্মের ধ্বজা জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বীয় দিব্য মায়া-বিভূতি অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে নরদেহ ধারণ করতঃ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এইজন্য গীতা জলদ গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—

* কাঁথি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পঠিত।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

হে ভরত কুলাবতংস অর্জ্জুন! যে যে সময় জগতে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে এবং দেশে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে, সেই সেই কালে, গ্লানি অপনোদন পূর্ব্বক নীতি ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং দুর্ব্বৃত্তগণের বিনাশ সাধন করিয়া, তাহাদের অত্যাচার হইতে সজ্জনবৃন্দকে রক্ষা করিবার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

তিনি আসেন সংস্কারকরূপে,—ধর্ম্মের মাঝে যেটুকু অধর্ম্মের প্রবেশ লাভ ঘটিয়াছে সেটুকু অপসারিত করিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য। অবতারপুরুষ ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া নবধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন না, বরং পূর্ব্বপ্রচলিত সনাতন বৈদিক ন্যায় ও সত্যধর্ম্মের সুধারণ ও সংশোধনই মাত্র করিয়া, তদানিন্তন কালের উপযোগী করিয়া উহা জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাৎকালিন যুগের উপযোগী করিয়া বলার তাৎপর্য্য এই যে, সত্যাদিকাল হইতে কলিকাল পর্য্যন্ত এই যুগ-গুলির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের জীবনীশক্তি, স্বাস্থ্য, শক্তিসামর্থ্য ও রুচির পরিবর্ত্তনও যথেষ্ট ঘটিয়া থাকে। সত্যযুগে যাহা স্বাভাবিক এবং সহজ ছিল, কলির পক্ষে তাহা একান্ত অস্বাভাবিক এবং আয়াস-সাধ্য অথবা একেবারে অসাধ্য। সেইজন্য সত্যধর্ম্মের,—সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের মূল তথ্যগুলি ঠিক করিয়া, ধর্ম্মটীকে তদানীন্তন প্রথা ও লোকের শক্তিসামর্থ্যের উপযোগী করিয়া, অবতার অথবা অবতার কল্প (অংশাবতার) পুরুষেরা আসিয়া সেই চির পুরাতনকে জগতে নব নব আকারে পুনঃ

প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। জগতের এই চিরন্তন সত্য (principle) কে লক্ষ্য করিয়া তাই অমর কবি Tennyson গাহিয়াছেন,-

"The old order changeth yeilding place to new ;
And God fulfils Himself in many ways,
Lest one good custom might corrupt the world".

পুরাতন প্রথা চলিয়া যায়, নূতন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। ভগবান্ সকল প্রথাতেই সেই যুগের উপযোগীভাবে একটা সার্থকতা রাখিয়াছেন। নচেৎ, যুগবিশেষে কোন প্রথা যদি কল্যাণপ্রসূ হইয়া থাকে, তাহা যদি চিরকালই থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহার ফল বিষময় হইত।

আমাদের বক্ষ্যমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হইতেছেন নরশ্রেষ্ঠ নৃপশার্দ্দুল, ধর্ম্মজগতের কিরীটভূষণ, আচার্য্যপ্রবর, নীতিকুশল, ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। ঘোর অনাচারী, সজ্জন-প্রপীড়ক জরাসন্ধ, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বেষী আসুরিক বৃত্তিসম্পন্ন ধনজন-যৌবনবল-মদোন্মত্ত স্বেচ্ছাচারী স্বার্থান্ধ রাজন্যবর্গের প্রবল উৎপীড়নে ধরিত্রী যখন জর্জ্জরীভূতা, দেশব্যাপী উৎপীড়িতের আকুল আর্ত্তনাদে অবনীমণ্ডল যখন পরিপূরিত হইয়া উঠিল, তখনই জগতে শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং ন্যায় ও ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য এই মহাপুরুষের শুভাগমন হইল। ইঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে। অসুরভাবাপন্ন ঘোর অত্যাচারী রাজা-গণের উৎপীড়নে ধরিত্রীদেবী প্রপীড়িতা হইয়া, গাভীরূপ ধারণ করতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মার সমীপে উপনীতা হইয়া, সাশ্রুনয়নে স্বীয় দুঃখের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী বিবৃত করিলেন। ব্রহ্মা ধরার দুঃখে ব্যথিত হইয়া, শঙ্কর ও অন্যান্য দেববৃন্দ সমভিব্যাহারে ধেনুরূপিণী ধরিত্রীকে সঙ্গে লইয়া, ক্ষীরোদ সাগরে শেষ-শায়ী নারায়ণকে বহুবিধ স্তবস্তুতি করিয়া ধরিত্রীর দুঃখের

কথা নিবেদন করিলেন। কিয়ৎকাল এইভাবে অতিবাহিত হইলে শ্রীভগবান্ বিষ্ণু অশরীরী বাণীরূপে সমস্ত দেবতামণ্ডলীকে, তাঁহার লীলা সহায়করূপে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ দিয়া, নিজে শীঘ্রই বসুদেব-গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করতঃ দুষ্টগণের বধসাধন করিয়া ধরিত্রীকে পাপমুক্ত করিবেন বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন। আরও বলিলেন ভগবান বিষ্ণুর অংশ-সম্ভূত সহস্রশীর্ষ অনন্তদেব শ্রীভগবানের লীলা-সহায়তার জন্য অগ্রেই জন্মগ্রহণ করিবেন এবং স্বয়ং বৈষ্ণবীমায়াও শ্রীভগবানের কার্য্যের সহায়তার জন্য শীঘ্রই শ্রীনন্দের মহিষী যশোমতির গর্ভে অবতীর্ণ হইবেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে পূতবংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৃষ্ণীবংশের বিবরণ সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়রাজ যদুপতি শূরসেন মথুরা নগরীতে বাসকরতঃ মাথুর এবং শূরসেনদিগের বিষয় ভোগ করিতেন। সেই বংশে আহুক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুইপুত্র—দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের কন্যা দৈবকী এবং উগ্রসেনের পুত্র কংস। বৃষ্ণি-বংশীয় যাদবরাজ বসুদেব, প্রধানা পত্নী রোহিণী দেবী বর্ত্তমান সত্ত্বেও, শূরসেন বংশীয় মহাবল উগ্রসেনের সহিত সখ্যতা স্থাপন মানসে তদীয় পিতৃব্য তনয়া সর্ব্ব সুলক্ষণযুতা, সুশীলা, নানাসদ্‌গুণভূষিতা, সৌন্দর্য্যের ললামভূতা দৈবকীর পাণিগ্রহণ করিলেন। নরপতি বসুদেব নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া নানালঙ্কারভূষিত, সুসজ্জিত অশ্বপরিচালিত বিচিত্র রথে আরোহণ করিলেন। পুরজন স্বদেশ গমনোন্মুখ নবদম্পতিকে নানাবিধ মাঙ্গলিক ধ্বনির আলাপনে বিদায়-দানে উদ্যত; দুহিতৃবৎসল মহারাজ দেবক কন্যাকে বহুমূল্য অশ্ব, গজাদি পশু, অসংখ্য রথ, পদাতিক এবং বহুসংখ্যক সুদর্শন দাস দাসী যৌতুক স্বরূপে উপহার দিয়া নবদম্পতীকে আপ্যায়িত করণে ব্যস্ত; মহাবল কংশ দেবকীর প্রীতি কামনায় স্বয়ং যাইয়া ভগিনীর রথের অশ্বগণের বল্গা ধারণ করিয়াছেন—কিছুদূর যাইবার

পর সহসা আকাশবাণী কংশকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"রে অবোধ! তুই যাঁহাকে বহন করিতেছিস্, ইঁহার অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তোর প্রাণ-বধ করিবে।" ভোজবংশের কলঙ্কস্বরূপ পিতৃহিংসক ক্রূরমতি কংশ সেই অশরীরী বাণী শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নবোঢ়া বালিকাবধূ দেবকীকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ করিলেন। এই আকস্মিক বিপদে সমবেত জনমণ্ডলী অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শান্তস্বভাব মহামতি বসুদেব এই অচিন্তনীয় ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, দুর্ব্বৃত্ত কংশকে অশেষ প্রকারে ন্যায় ও যুক্তি প্রদর্শন করাইয়া এই ঘৃণিত তাণ্ডব-অভিনয় হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু যে দুরাচার লোভের পরবশ হইয়া রাজ্যশাসন মানসে বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই, সেই পাপাত্মা কংশকে তাহার অসৎ সঙ্কল্প হইতে বিরত করা যে কি দুঃসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক, অবশেষে অনেক বুঝাইবার পর, অনেক সাধ্য সাধনার পর, ভগবদিচ্ছায় সেই ক্রূরমতি কংশ তাহার ঘৃণিত পাপা-চরণ হইতে নিবৃত্ত হইল, কিন্তু এইরূপ স্থির হইল যে, দেবকীর গর্ভে যে সন্তান ভূমিষ্ট হইবে, তাহাই কংশের নিকট বধার্থ প্রেরিত হইবে। যাহা হউক, এইরূপ প্রস্তাবে নব পরিণীত বর ও বধূ আসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত হইলেন বটে কিন্তু একেবারে নিষ্কণ্টক হইতে পারিলেন না।

দেবকীর গর্ভে একে একে ছয়টী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল; পাষাণ হৃদয়, পাপচরিত কংশও একে একে ছয়টী সন্তানেরই প্রাণনাশ করিল। প্রথম পুত্রটী কংশ বসুদেবকে প্রথমে ফিরাইয়া দিলেও নারদের বাক্যে ভীত হইয়া পুনরায় তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। অতঃপর দেবকীর সপ্তমবার গর্ভসঞ্চার হইলে ভগবান্ বিষ্ণুর ইচ্ছায় যোগমায়া দেবী সেই গর্ভস্থ সন্তানকে আকর্ষণ করতঃ বসুদেবের অন্যতমা মহিষী রোহিণী দেবীর গর্ভে উহা স্থাপন

করিলেন। তৎকালে রোহিণীদেবী কংশ-ভয়ে ভীতা হইয়া গোকুলে বসুদেবের প্রিয়সখা নন্দরাজ ভবনে গোপনে অবস্থান করিতেছিলেন। যোগমায়া দেবী যখন গর্ভস্থ সন্তানকে দেবকীর গর্ভ হইতে অপসারিত করেন তখন পুরোবাসীগণ দেবকীর গর্ভ নষ্ট হইল মনে করিয়া অতীব বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। ওদিকে রোহিণীদেবী যথাসময়ে একটী সুকুমার সুলক্ষণাক্রান্ত দেবশিশু প্রসব করিলেন। সেই প্রিয়দর্শন কুমার জগতে "রাম" বা সকলের আনন্দ বর্দ্ধক এবং অমিত ক্ষমতাশালী বলিয়া "বলভদ্র," এবং যোগমায়া কর্ত্তৃক কর্ষিত হওয়ায় "সঙ্কর্ষণ"—নামে অভিহিত হইলেন।

মহর্ষি নারদ আসিয়া কংশকে সতর্ক থাকিবার জন্য বলিয়া গেলেন যে, কংশের নিধনের জন্য শ্রীভগবানের ইচ্ছায় দেবগণ যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং হৃষীকেশও দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইবেন। নারদের বাক্যে অতিমাত্র সন্ত্রস্ত হইয়া কংশ বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে শৃঙ্খলিত অবস্থায় প্রহরীবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন।

এইরূপে দেবকীর সপ্তমগর্ভও বিনষ্ট হইল। কিছুকাল এইভাবে বিষাদের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইল। এইবার অষ্টমগর্ভে ভগবান বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিলেন। দেবকীর এই অষ্টমবারের গর্ভ সঞ্চার সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব কাহিনীর বর্ণনা রহিয়াছে। একদা নিশীথে উৎপীড়িত, শৃঙ্খলিত রাজদম্পতি বিষাদ ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া, নিজ নিজ দুঃখ কাহিনী ভগবানের নিকট নিবেদন করিয়া ব্যথাতুর হৃদয়ে কংশকারাগারে নিদ্রিত রহিয়াছেন এমত সময় অপূর্ব্ব জ্যোতিতে কারাগারের সেই নিবিড় অন্ধকার অপসারিত করিয়া, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার দিব্যতেজে দম্পতিকে দিব্যশক্তিতে শক্তিমান্ করিয়া, দেবকীর জঠরে জ্যোতিঃস্বরূপে প্রবিষ্ট হইলেন। শুদ্ধসত্বা

দেবকী মাতার এবম্বিধ দিব্য উপায়ে গর্ভসঞ্চার হইলে, তাঁহার অঙ্গের অপূর্ব্ব কান্তিতে কারাগারের ঘনান্ধকার দূরীভূত হইল। একদা দেবকী দেবীর শ্রীঅঙ্গের সেই অত্যদ্ভুত লাবণ্য নয়নগোচর হওয়ায় কংশের সন্দেহ হইল, 'ভগিনীর এই অষ্টমগর্ভে নিশ্চয়ই আমার নিহন্তা শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর আবির্ভাব হইয়াছে। নতুবা দেবকীর অঙ্গশ্রী এরূপ দিব্যপ্রভায় কেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে?' যাহা হউক, এই চিন্তায় বিশেষ সন্ত্রস্ত হইয়া কংস প্রহরীদিগের উপর আরও কঠোর পাহারার আদেশ দিয়া, একান্ত শঙ্কাকুল চিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

পূর্ণগর্ভা দেবকী-রাণীর প্রসবের সময় আসন্ন হইল। শরতের ঠিক এই দিনে রাত্রিকালে আকাশ ক্রমে মেঘমুক্ত হইয়া তারকাহারে ভূষিত হইয়া, অপরূপ সৌন্দর্য্যের বিস্তার করতঃ মৃদুমন্দ হাসিতেছিল। কৃষ্ণ-পক্ষের অষ্টমী তিথি;—রোহিণী নক্ষত্রও উদিত হইয়াছে। আকাশ মেঘমুক্ত হওয়ায় এবং তারকাপুঞ্জের প্রকাশ হওয়ায় অবনীতলে নদ নদী-বক্ষে বিশাল নক্ষত্রখচিত অম্বর-তলের স্বচ্ছ-ছায়া পতিত হইল। কুমুদ কহ্লার নিচয় ধীর মন্থর প্রবহমান পবন-হিল্লোলে স্নিগ্ধ লহরী-মালায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। সমীরণসনে পবিত্র গন্ধ প্রবাহিত হইতে লাগিল, ভক্ত ও সাধক মণ্ডলীর চিত্তে পূত ভাবের উদয় হইল। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মকাল আসন্নপ্রায় দেখিয়া কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ গান, সিদ্ধ ও চারণগণ স্তব এবং বিদ্যাধরগণ অপ্সরাকুলে পরিবৃত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল; দেবতা ও ঋষিবৃন্দ পুলকিতচিত্তে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি মাতার এই প্রাণমাতান দিব্য শোভার ক্রমে পরিবর্ত্তন হইল। নৈশ আকাশ ক্রমে ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল। সেই ঘন-তিমিরাবগুণ্ঠনে আবৃতা ঘোরা যামিনীর দ্বিতীয় প্রহরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূমিষ্ট হইলেন। তৎকালে সাগরের বিপুল

হুঙ্কারের সহিত সুরলয়-সংযোগে জলধর যেন প্রলয়মন্দ্রে এক একবার আকাশ পাতাল দিশম্বিয়া প্রকম্পিত করিতে লাগিল। পূর্ব্বদিক হইতে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় দেবকী দেবীর পূতগর্ভ হইতে সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবান্ বিষ্ণু অবতীর্ণ হইলেন। বসুদেব দেখিলেন, সেই বালক বড়ই অদ্ভুত। তাঁহার আয়ত নয়ন যুগল কমলদলের ন্যায় মনোরম; তাঁহার অপূর্ব্ব তেজোদীপ্ত চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পাইতেছে—গলদেশে দ্যুতিমান্ কৌস্তুভমণি দোদুল্যমান; তাঁহার সুগঠিত অঙ্গের ঘননিবিড় জলদকান্তি বড়ই মনোরম দেখাইতেছিল। বালকের ঘনকুঞ্চিত চিকুর-জাল মহামূল্য বৈদূর্য্য, কিরীট ও কুণ্ডলের অপূর্ব্ব প্রভায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। মহামূল্য মেখলা, অঙ্গদবলয় এবং কঙ্কনাদি অলঙ্কারে ভূষিত হওয়ায় তাঁহার অপার্থিব শরীরের শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ আসিয়া তাঁহার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। বসুদেবও ক্ষণেক আত্ম-বিস্মৃত হইয়া সেই দেব-শিশুর অপূর্ব্ব রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীভগবানের দৈবীমায়ায় সকলে আচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রাদেবীর কোমল অঙ্কে আশ্রয় লইয়া সুপ্তিমগ্ন হইয়া পড়িল। দেবকী মাতাও সেই দেব-শিশুর অলৌকিক রূপ-মাধুরিমা নয়ন ভরিয়া দেখিয়া ধন্য হইলেন। কারাগারের প্রহরীরা সকলেই সুপ্তিমগ্ন। সেই অসংখ্য প্রহরী বেষ্টিত বিরাট বন্দীশালা ভগবদিচ্ছায় এক বিরাট স্বপ্নপুরীতে পরিণত হইল। ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, বসুদেব ও দেবকী সেই চতুর্ভুজরূপ দর্শন করিয়া নানাবিধ স্তব স্তুতি করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে সেই চতুর্ভুজ রূপ হইতে শিশুরূপধারী ভগবানকে লইয়া বসুদেব তখনই নন্দালয়ে গোকুলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভগবদিচ্ছায় তাঁহার হস্তপদের শৃঙ্খল খসিয়া পড়িল। এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে বন্ধনমুক্ত হইয়া তিনি সেই নবজাত শিশুকে অতি সন্তর্পণে স্বীয়

অঙ্কে ধারণ করতঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন যাদুমন্ত্র প্রভাবে বন্দীশালার সেই বিশাল সুদৃঢ় লৌহদ্বার নিঃশব্দে উন্মুক্ত হইল। বসুদেব হৃষ্টচিত্তে সেই উন্মুক্ত দ্বার-পথে শিশুরূপী ভগবানকে লইয়া একাকী জন-মানবহীন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় চতুর্দ্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার বিরাজ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মুশলধারে ঝড় ও বৃষ্টি প্রলয়ের মহারব তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিল। সম্মুখে ভীমনিনাদিনী নীলা যমুনা প্রবাহিতা; বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারায় স্ফীত কলেবরা হইয়া তরঙ্গ ভঙ্গে তটভূমি বিধ্বস্ত করিতে করিতে প্রচণ্ড বিক্রমে প্রবাহিতা। এমত অবস্থায়, কি করিয়া এই শিশুকুমারের প্রাণরক্ষা হয়, এই চিন্তাই বসুদেবকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে; এমন সময় সহসা সৌদামিনী ঘন যবনিকাস্তৃত আকাশের বক্ষভেদ করিয়া, একবার তীব্র দীপ্তিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া মেঘান্তরালে অন্তর্হিতা হইল। বসুদেব সেই ক্ষণিক আলোকপুঞ্জে দেখিলেন, একটী শৃগাল সেই দুরন্তা তটিনী এই দুর্যোগে পার হইতেছে। তাহা দেখিয়া তাহার হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইল। তিনি শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া সেই জম্বুকের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মধ্যে মধ্যে ক্ষণপ্রভার কীরণসম্পাতে দিঙ্ নির্ণয়ের অসুবিধা দূর হইল, এবং ঐ শৃগালও অগ্রে অগ্রে নন্দালয়াভিমুখে যাইতে লাগিল। ভগবান্ বাসুকী শিশুরূপী নারায়ণকে বারিধারা হইতে রক্ষা করিবার জন্য, পিতা পুত্রের মস্তকে স্বীয় বিশাল ফণারূপ ছত্র ধারণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যথাসময়ে নন্দরাজ-ভবনে সপুত্র বসুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বৈষ্ণবী শক্তি যোগমায়া দেবীও যশোদার গর্ভে কন্যারূপে ঠিক সেইদিন সেই মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বসুদেব নন্দালয়ে উপনীত হইলে গোপরাজের গৃহদ্বার স্বতএবই উন্মুক্ত হওয়ায় তিনি সেই শিশু-কৃষ্ণকে

অঙ্কে লইয়া রাণী যশোমতী বা যশোদামাতা যে কক্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সেই দেবকন্যাকে প্রসব করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। বসুদেব আর কাল বিলম্ব না করিয়া শিশুটীকে যশোদা মাতার পার্শ্বে শায়িত করিয়া, তাঁহার সদ্যজাত কন্যাকে লইয়া, পুনরায় সেই দুর্যোগে যমুনা পার হইয়া কংসকারাগারে উপনীত হইলেন এবং ক্রোড়স্থ শিশু কন্যাটীকে সেই নিদ্রাতুরা শৃঙ্খলিতা দেবকীর পার্শ্বে শায়িত করিলেন। দৈবীমায়ায় আবার তিনি পূর্ব্ববৎ কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ হইলেন। সুদৃঢ় লৌহময় কারাদ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ হইল। তিনি যেমন শিশুটীকে শোয়াইয়া দিলেন, অমনি সে কাঁদিয়া উঠিল। প্রহরীগণ সন্ত্রস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ মহারাজ কংশের সমীপে উপনীত হইয়া নবজাত শিশুর সংবাদ জ্ঞাপন করিল। রাজাও এই সংবাদের জন্য এতদিন উদ্বিগ্নচিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সত্বর শয্যাত্যাগ করিয়া সূতিকাগাররূপ কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়া, সেই সদ্যপ্রসূত সন্তানটীকে রোরুদ্যমানা জননীর স্নেহময় অঙ্ক হইতে নির্ম্মমভাবে আকর্ষণ করিয়া এবং উহার পদদ্বয় ধারণ করতঃ শিলাপৃষ্ঠে উহাকে নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে সেই কন্যা সহসা তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া, উর্দ্ধে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া অষ্টভূজা মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন। তাঁহার দিব্য জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। এই অমিত প্রভাসম্পন্না বরবর্ণিনী ভগবতী দুর্গাদেবী (বিন্ধ্যবাসিনী) বলিয়া উঠিলেন,—"রে দুর্ম্মতে! আমাকে বধ করিয়া তোর কি লাভ হইবে? তোর পূর্ব্বশত্রু, তোর নিধনকর্ত্তা শ্রীভগবান্ বিষ্ণু অন্য কোথাও জন্মপরিগ্রহ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং, অন্যান্য নির্দ্দোষ শিশুকে হত্যা করিয়া পাপের মাত্রা আর বর্দ্ধিত করিস্ না।" দেবী এই বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। কংশ ভগবতীর এই অশ্রুত-

পূর্ব্ব বাণী শ্রবণ করিয়া দেবকী ও বসুদেব সকাশে গমনান্তর তাঁহাদিগের নিকট অশেষ প্রকারে ক্ষমাভিক্ষা করিয়া, তাঁহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিলেন। এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও নন্দরাজ ভবনে অবস্থান পূর্ব্বক নানা লীলাদ্বারা শৈশব অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

বর্ষা-বিরহ

(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়।)

সজল জলদ হেরি, আজি কানু পড়ে মনে,
কিশোরে কিশোর-খেলা— সে কিশোর সনে!
কতদিন গিয়াছে যে, শুনি নাই তার বাঁশী,
নিরাশে অধীর হিয়া— পরাণ উদাসী,
বল, বাঁচি কেমনে?
সজল জলদ হেরি, আজি কানু পড়ে মনে॥

শূন্য কদম্ব-মূল, শূন্য সে কালিন্দী কূল,
শূন্য সে মাধবী-তল— সে মাধব বিনে,
শূন্য বরজ-পুরী, কাঁহা সেই বংশীধারী
কেমনে ধৈরজ ধরি—এ পোড়া পরাণে,
বল, বাঁচি কেমনে?
সজল জলদ হেরি, আজি কানু পড়ে মনে॥

কি করি কোথায় যাই, কোথা গেলে কানু পাই?
আমি, পরাণ রাখিতে চাই—সে কানু-চরণে,
বল, বাঁচি কেমনে?
সজল জলদ হেরি, আজি কানু পড়ে মনে॥

নন্দনন্দন

(প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী এম, এ।)

কংসের অকথ্য অত্যাচারে ধরণী দীনা ক্ষীণা নিরাশ্রয়া। করুণাময়ের করুণা আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষায় ক্ষীরোদসাগরতীরে ধরণী গাভীর মূর্ত্তি ধরিয়া সমাগতা। সম্মুখে বিস্তীর্ণ দুগ্ধ-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ বিচিত্র সমুদ্র। অদূরে সমুদ্র-গর্ভে শ্বেতদ্বীপ। শুভ্র অঙ্গলাবণ্য ছড়াইয়া শেষনাগ আপন শরীর প্রসারিত করিয়া নবনিবিড়নীল নীরদবর্ণ ভগবান্ বিষ্ণুর শয্যা ও আসন রচনা করিয়াছেন। বিষ্ণু অনন্তভোগশয়নে কমলাসেবিত হইয়া পরম আনন্দে রহিয়াছেন যেন বিশ্বব্যাপার হইতে একেবারেই সম্বন্ধরহিত। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ধরণীর দুঃখের কথা জানাইয়া ভগবানের স্তব করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। তখন আনন্দময়ের অমৃতবাণী শুনিতে পাইয়া সজাগ হইয়া বলিতে লাগিলেন। আর ভয় নাই আমরা ধরণীর ব্যথার কথা জানাইবার আগেই নিখিল ব্যথাহারি হরির প্রাণে সে কথা জাগিয়া উঠিয়াছে।

বসুদেব গৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তুসুরস্ত্রিয়ঃ॥

ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন সাক্ষাৎ পরম-পুরুষ আপন বিশ্ববিমোহিনী মায়ার সহিত অনতিবিলম্বেই ধরার বুকে অবতীর্ণ হইয়া বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারই লীলার সহায়তা ও প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য মানব-গৃহে দেবতা ও দেবপত্নীগণেরও জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

দানবপ্রকৃতি কংসের অত্যাচার কমিবার নয়। যেটি যার প্রকৃতি সেটি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যে ভাবেই হউক করিতেই হয়। দৈবভাব কংসের অসহ্য! পবিত্রতা এবং সমাজের মঙ্গলকে পদদলন করাই তাহার দানবীয় সুখ পাইবার একমাত্র উপায়। তাহাতেই কংসরাজের গো-ব্রাহ্মণ-অতিথি-সেবা দেবতার কার্য্য, সকলই নিন্দিত! সত্যকে গলা চাপিয়া মারিবার জন্য দানববাহিনীর—কংসদূতের সকল চেষ্টা নিয়োজিত।

কংস ভগ্নী দেবকীর বিবাহ দিলে পবিত্রতা ও মূর্ত্তিমতী সেবা রূপা দেবকীকে নিখিলদৈবভাব সমষ্টি বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ পরম মঙ্গলের একান্ত অধিষ্ঠান বসুদেব বিবাহ করিয়া আপন গৃহে লইয়া চলিলেন। পবিত্রতা ও সেবার প্রতীক দেবকী যেদিন বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় বসুদেবগৃহের সম্মুখীন হইতে লাগিল কংসপুরী সেদিন হইতে পবিত্রতা ও সেবা হারা হইল। সেই পুরীর রাজা কংসের দানবপ্রকৃতি তখনই আপন প্রাণের সাড়া দৈববাণীর মধ্য দিয়া শুনিয়া লইল। অন্ধকার আলোকরাজ্যের বাহিরে চলিয়া যায়। অজ্ঞান জ্ঞানের কাছে পরাজিত হয়। অপবিত্রতা পবিত্রতা দ্বারা পুণ্যময় হইয়া উঠে। আসুর ভাব দৈবভাবের হাতে মরিয়া যায়। কংস শুনিল সেই মহান সত্য—"এই দেবকীর অষ্টম গর্ভ তোর মৃত্যুর হেতু।"

সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা ও সেবারূপিণী দেবকীর কাছে কাছে থাকিয়া এতদিন কংস আপন প্রকৃতির পরিচয় খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। দেবকীরপ্রভাবে তাঁহারই স্নেহে অন্তর স্নিগ্ধ হইয়াছিল। আজ দেবকীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার মুহূর্ত্তেই তাহার দানব প্রকৃতির ভীষণ পরিণামের সঙ্কেত দৈববাণীর মধ্যে হঠাৎ খুব তীব্র অথচ স্পষ্টভাবে শুনিতে পাইয়া কংস ক্ষণেকের জন্য চমকিত হইল। আবার তৎক্ষণাৎ দানবভাবের অনুকূল বৃত্তি জাগিয়া উঠিতেই কংস দেবকীর কেশাকর্ষণ করিয়া ভগ্নীহত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। বসুদেব

নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া পুত্র জন্মগ্রহণ করা মাত্র কংসের হাতে সমর্পণ করিবার অঙ্গীকারে কোনওমতে দেবকীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইহার পর আট বৎসর অতীত হইয়াছে প্রতি বৎসরই একটি করিয়া সন্তান হইয়াছে আর একে একে কংসের হাতে মরিয়াছে। কি দুঃখে যে এ কয় বৎসর বসুদেব দেবকীর কাটিয়াছে তাহা বর্ণন করা নিতান্তই অসম্ভব, তবু দিনের পর দিন চলিয়া গিয়াছেই। এবার দেবকীর দৈববাণী কথিত অষ্টম গর্ভ। কাজেই কংস পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিল; গর্ভ লক্ষণ প্রকাশিত হইতেই পরমসত্য বস্তুর উপলক্ষ দেবকী ও বসুদেবকে সে কারাগারে বন্ধ করিয়া রাখিল। হাতে পায়ে গলায় লোহার শিকল, লৌহ-কবাট-রুদ্ধ কারাগার, দ্বারে দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী, আর কারাগারের ভিতরে শূন্য হাহাকার ও কাতর প্রার্থনা। দীর্ঘ আটটী মাস এই ভাবে কাটিয়া গেল।

ভাদ্র মাস। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। চারিদিক ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। গভীর রাত্রি জনমানবের সাড়া নাই। আকাশ নিবিড় জলদাবৃত। কংসপুরী নিদ্রিত। পুরীর বাহিরে কারারক্ষী বহু বিনিদ্র রজনী কাটাইয়াছে, কিন্তু আজকার দিনে ক্লান্ত দেহ ছড়াইয়া দিয়া তাহারাও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চারিদিক্ ছাইয়া যখন এই ভীষণ নিস্তব্ধতা তখন স্বর্গে মৃদু মধুর দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। অপ্সরা-কিন্নর-কণ্ঠে মধুর সুরে গান আরম্ভ হইল। দেবতারাও কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সাগর সঙ্গীতের সঙ্গে তান যোগ করিবার জন্যই যেন মেঘও আকাশে মন্দ্রধ্বনি করিতে লাগিল। একি এ! কারাগারের অন্ধকার বুক পূর্ণ আলোকে ঝলকিত করিয়া এ কে আবির্ভূত হইলেন? দক্ষিণ উর্দ্ধকরে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, বাম উর্দ্ধকরে সুদর্শন চক্র, দক্ষিণ অধঃকরে কৌমুদকী

গদা, ও বাম অধঃকরে লীলাকমল বিরাজিত—শিরে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল ও সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ ভূষণ; গলে বৈজয়ন্তী মালা বিলম্বিত—পীতাম্বর, মধুররণিত নূপুরমণ্ডিত রাতুল চরণযুগল মহাপুরুষ লক্ষণান্বিত সর্ব্বাবয়ব এই যে শ্রীবাসুদেব। ওঁ নমোভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীভগবান বাসুদেব জন্মগ্রহণ করিবার পর কিরূপে বসুদেব দেবকী ভগবৎস্বরূপে তাঁহাকে স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া তাঁহার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি গোপন করিয়া দ্বিভুজ হইয়াছিলেন—এ সকল কথা পুরাণে বিশেষভাবেই বর্ণনা আছে। সনাতন ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তি-মাত্রেই সেই কথা কিছু না কিছু জানেন। সে ইতিহাস বর্ণনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ভগবানের আবির্ভাবকথা বিভিন্ন আদর্শ লইয়া কেমন করিয়া আলোচিত হইয়াছে এখন আমরা সেই সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

জাগতিক বস্তূপলব্ধির রীতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাই এক বস্তুই বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন দিক্ দিয়া আস্বাদিত হয় ও প্রয়োজন হয়। রজকের কাছে জল কাপড় ধুইবার প্রধান উপকরণ। বৈজ্ঞানিকের অনুভূতিতে জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন্ সমবায়। আবার সেই জল কৃষকের শস্য উৎপাদনের পরম উপাদান। তৃষ্ণাকুল পথিকের কাছে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কোন বৈশিষ্ট্যই স্ফূর্ত্তি পাইবার অবসর নাই, সে জল পাইলে প্রাণে বাঁচে আর জলের অভাবে তাঁহার প্রাণ যায় এইমাত্র সে অনুভব করিয়া থাকে। জলই তাঁহার জীবন।

শ্রীগীতায় দেখিতে পাই, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, ধার্ম্মিকের নির্য্যাতন, অধার্ম্মিকের প্রভাব তখনই ভগবানের আবির্ভাব। ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও অধর্ম্মের দূরীকরণ, ধার্ম্মিকের রক্ষা ও অধার্ম্মিক অসাধুর বিনাশ করার জন্যই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ভগবানের

আগমনে জগতের যতপ্রকার গ্লানি সবই দূর হইয়া যায়, পাপী পাষণ্ডী উদ্ধার লাভ করে।

ভগবানের চরণকমলস্পর্শে ত্রিতাপদগ্ধ পতিত জীবের অন্তর পুণ্য পবিত্রতায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আসুর ভাব দূর হইয়া জগতে দৈব-ভাবের সুপ্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। কংসের অত্যাচারে ধরার বুকের উপর যখন অধর্ম্ম সহায় পাপের তাণ্ডব লীলা চলিয়াছে বসুদেব দেবকীর নির্য্যাতন যখন চরম সীমায় পৌছিয়াছে, জীবজগৎ যখন আসুরভাবের প্রভাবে আক্রান্ত হইয়া শূন্যে বাহু তুলিয়া হাহাকার ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে তখন স্বর্গে শ্রীভগবানের মর্ত্ত্যে আগমন সূচনা করিয়া দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অতি বাল্যকাল হইতেই ছলনা, কপটতা, পাপ, অত্যাচার নিপীড়ন এবং মৃত্যুর সহিত কৌতুকময় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহারা পার্থসারথীর কূটরাজনীতি, অশেষ ধৈর্য্য, অবিচল সহিষ্ণুতা অনতিক্রমণীয় শৌর্য্যের দিকে মন রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মকে জাতীয় জীবনের একটা পরম সার্থক দিন বলিয়া মনে করেন, তাহারা অনেক সময় কেন জানি না গোকুলে গোপালবেশী পূতনারি, অঘারি-বকারি-কালিয়গঞ্জনকারী মহাবীর বালকের কথা উল্লেখ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। বৃন্দাবনে গোপগোপীর সহিত রসময়ীলীলা ভিন্নও যে অসুরদলন লীলা খুবই চলিয়াছে সে কথা ভুলিয়া গেলে বালক গোপালের অনেকখানি কথাই বাদ পড়িয়া যায়। যিনি ঈশ্বর হইয়াও মানবশিশু তাঁহার ঈশ্বরত্বকে বাদ দিয়া মানবত্ব লইয়া থাকিলে একাংশ মাত্র গ্রহণ করা হইল; আবার যিনি মানব হইয়াও ঈশ্বরীয় শক্তি প্রকাশ করেন তাহার মানবত্ব বাদ দিয়া ঐশ্বরিক অংশের গ্রহণেও একাংশই গ্রহণ করা হয়। কাজেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভৌম প্রকাশে বা জগতে অবতার কালে তাঁহার দুইটী দিক্ ধরিয়াই আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে।

২

যদিও শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, যদিও তিনি পার্থসারথী—শুধু সারথী নন, যখন ভীষ্মদেব অপূর্ব্ব কৌশলে অস্ত্রবর্ষণ করিয়া মধ্যম পাণ্ডবকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন; অশ্ব, রথ, পতাকা সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে তখন যিনি ভক্তাধীন হইয়া ভীষ্মদেবের প্রতিযোদ্ধা—শরশয্যায় শায়িত অন্তিমদশায় পরমপুরুষের একান্ত উপাসক সত্যের সাধক গোবিন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত তখন প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও মানবরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে রথের চাকা তুলিয়া ছুটিয়া আসিলেও তাঁহার পরমেশ্বরত্ব ভুলিয়া যান নাই। তিনি বলিলেন—

শতবিশিখহতো বিশীর্ণদংশঃ ক্ষতজপরিপ্লুতো আততায়িনো মে।
প্রসভমভিসসার মদ্বধার্থং স ভবতু মে ভগবান্ গতির্মুকুন্দঃ॥

(ভাঃ ১।৯।৩৫)

আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার অনুরোধে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে। ভক্ত-রক্ষার ছলে রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া রথের চাকা ছুঁড়িয়া আমাকে মারিবার সময় পৃথিবী কাঁপাইয়া সিংহের বিক্রমে স্খলিত উত্তরীয় শ্রীকৃষ্ণ আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। আমি তখন বার বার খরধার শর নিক্ষেপ করিয়া ইহার কবচ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলাম। অঙ্গ হইতে রুধিরধারাও বিগলিত হইতেছিল। অর্জ্জুনের নিষেধ সত্ত্বেও যিনি স্বহস্তে আমাকে মারিবেন বলিয়া আমার সম্মুখে আসিয়াছিলেন। এই অন্তিম সময়ে সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার গতি হউন। তাঁহারই চরণে আমি শরণ লইলাম।

জন্মসময়ে বাসুদেব যে অপূর্ব্ব চতুর্ভুজ রূপ বসুদেব দেবকীকে দেখাইয়াছেন—শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্ম ধারণ করিয়া যেরূপে কংসের বিনাশ করিয়াছেন যে মূর্ত্তি দেখাইয়া ভুলাইয়া লইয়া পর্ব্বতগুহায় কালযবনকে

নিহত করিয়াছেন, যে সৌম্য চতুর্ভূজ মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য বিশ্বরূপ দর্শনের পর ভীত অর্জ্জুন আকুল প্রার্থনা করিয়াছিলেন—সেই চতুর্ভূজ মূর্ত্তির মধ্যেই মহাপুরুষলক্ষণগুলি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-নিপুন ঋষিগণ সমগ্র জগতের তত্ত্ব উহার মধ্যেই দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের চোখে কৌস্তুভমণি শুদ্ধ-জীব-চৈতন্য। উহারই প্রভা শ্রীবৎসচিহ্নরূপে ভগবান হৃদয়ে ধারণ করেন। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন সাধুগণের হৃদয় আমাতে—সাধুগণের হৃদয়ও আমি! সেই সাধুগণকেই ভক্ত-ভক্তিমান্ ভগবান্ আদর করিয়া শ্রীবৎস এবং কৌস্তভ রূপে শ্রীঅঙ্গে ধারণ করিয়া আছেন। বনমালা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার বৈচিত্রী। সামঋক্‌যজুর্ব্বেদ তাঁহার পীত বসন। বক্ষে যজ্ঞোপবীত উদাত্ত অনুদাত্ত এবং স্বরিৎ এই ত্রিবিধ স্বর। সাংখ্য ও যোগ দুই কর্ণের উজ্জ্বল কুণ্ডল। করে কমল সত্ত্বগুণদ্যোতক। গদা বলযুক্ত প্রধান প্রাণতত্ত্ব। রসতত্ত্ব শঙ্খ এবং তেজঃ তত্ত্ব সুদর্শন ধারণ করিয়া ভগবান সর্ব্বতত্ত্ব সমবায়। ভগবৎ সম্বন্ধীয় অন্যান্য ভূষণাদিরও এইরূপে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, শুধু দিক্ দর্শনের জন্য কয়েকটীর উল্লেখ করা হইল মাত্র। ভগবান্ মানব লীলা করিয়াও যোগী সাত্ত্বিকগণের সাধনার মধ্যে পরম তত্ত্ব বা নিখিল তত্ত্বের অধিষ্ঠানরূপেই উপাসিত হইয়াছেন।

জগজ্জীবের রসহীন ক্লেশবহুল জীবনের দুর্দ্দশা পর্য্যালোচনা করিয়া যাঁহারা শ্রীভগবানের আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষায় জীবনযাপন করেন তাঁহারা শ্রীভগবানের আবির্ভাবে পরমানন্দিত হন। নব মেঘের উদয়ে কৃষকের যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ; শ্রীভগবান্ গোলক হইতে ভূলোকে নামিয়া আসিয়া তাঁহার অনন্ত রসময় লীলামৃত বর্ষণ করিয়া জীবজগতের অসরস প্রাণ সরস করিয়া দেন এই ভাবিয়াই বিশ্বকল্যাণকামী ভাগবত মহাপুরুষগণের পরম আনন্দে প্রাণ নাচিয়া উঠে। সাধনার সিদ্ধি লাভ

করিবার যে ক্রম সেই দিক্ দিয়াও ভগবানের জন্মকথার আলোচনা আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ যে না করিয়াছেন তাহা নয়। তাঁহাদের দর্শনরীতিতে দেবকী দেবী ভক্তি মূর্ত্তিমতী। ভক্ত ভক্তি-সম্পত্তি লাভ করিলেও কিছু কিছু বিষয়ভোগ কিন্তু নিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত থাকিয়াই যায়। তবে ঐ গুলি সংসার-ভয়ে একে একে নষ্ট হইয়া যায়। সাধক ভক্ত মনে করে এই রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ভোগে আকৃষ্ট হইলে আমাকে আবার জন্মমরণের দুঃখ সহ্য করিতে হইবে। কংসকে ভয়ের অবতার বলা হইয়াছে। বিষয়ভোগ বাসনারূপ দেবকীর ষট্ গর্ভ ভয়রূপী কংসের হাতে একে একে বিনষ্ট হইল তারপর সপ্তম গর্ভে সঙ্কর্ষণ বলদেব প্রেম-স্বরূপ। বিষয় ভোগ বিনষ্ট হইলে ভক্ত-হৃদয়ে নির্ম্মল প্রেমের উদয় হয়। এই পবিত্র প্রেমেই শ্রীভগবানের আবির্ভাব। ভক্তির অষ্টম গর্ভে এইরূপে ভগবানের জন্ম। ইহাই সাধনার সিদ্ধি।

অজ নিত্য-শাশ্বত শ্রীভগবানের আবার জন্ম কি? উহা কি মানবের মতই স্ত্রী পুরুষের মিলনে সাধারণ মানবশিশুর মত হইয়া থাকে? এই প্রশ্ন অনেকের মনেই হইয়া থাকে, তাই তাঁহারা অবতার স্বরূপকে মহা-পুরুষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শ্রীগীতায় বিভূতিযোগ প্রসঙ্গে ভগবান্ বলিয়াছেন যেখানে যেখানে কিছু বিচিত্র শক্তির সমাবেশ দেখিবে—যাহা অপূর্ব্ব শক্তিময় বলিয়া অনুভব করিবে—তাহাই আমার অংশ সম্ভূত বলিয়া জানিবে। মহাপুরুষগণ তাঁহারই অংশসম্ভূত। তাঁহারা স্বয়ংই ভগবান্ একথা কিন্তু গীতার উপদেশ হইতে বুঝা যায় না। ভগবান্ বরং বলিয়াছেন সকলের আমা হইতেই উৎপত্তি হইয়াছে। আমি কিন্তু কাহারও অধীন নই। সকলে আমারই অধীন। ত্রিগুণমোহিত হইয়া স্বতন্ত্র, অব্যয়, পরম স্বরূপকে জানা যায় না। বহু জন্মের পর জ্ঞানলাভ করিরা আমাতে প্রপন্ন হইলে বাসুদেবময় ভুবনদর্শন-

লাভ হইয়া থাকে। এরূপ মহাত্মা অতিশয় দুর্লভ। "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।" যখন শ্রীভগবান্ জগতে আবির্ভূত হন তখনও তাঁহাকে কর্ম্মফলের অধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই পরম রহস্য উপদেশ শ্রীগীতায় সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতিসোঽর্জ্জুন। (গীতা ৪।৯)

আমার জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য—এইরূপে যিনি উহা তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন তাহার দেহত্যাগের পর আর পুনর্জন্ম হয় না, তিনি আমাকেই লাভ করেন।

বিহার-শয্যা-আসনে ভগবানের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করিয়াও অর্জ্জুন বিশ্বরূপদর্শনের পর আপন সখা শ্রীকৃষ্ণকে পিতা মাতা ধাতা বলিয়া স্তব করিয়াছেন। ঈশ্বরভাব তখন ভাল করিয়াই অর্জ্জুনের চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজসূয় যজ্ঞে অগ্রপূজা কে পাইবে এই বিচারেও যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের লোকোত্তর গুণাবলি ও মহিমা স্মরণ করিয়া তাঁহার দেবভাব অঙ্গীকার করিয়া পরমেশ্বরবুদ্ধিতেই রাজন্যবর্গের কাহারও কাহারও মত না থাকিলেও তাঁহাকে অগ্রপূজার উপহার দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তাঁহার কাছেই তত স্পষ্ট - তত সত্য, যাঁহার হৃদয়ে যতখানি গাঢ় প্রেম। প্রেমেই ভগবানের আবির্ভাব, প্রেমের গাঢ়তা দিয়াই তাঁহাকে কাছে পাওয়া যায়, পুত্ররূপে বন্ধুরূপে পাওয়া যায়। প্রহ্লাদ-ভয়ভঞ্জনকারী—হিরণ্যকশিপুদলনকর্ত্তা শ্রীনৃসিংহদেব জড় মণিস্তম্ভ হইতে প্রকাশিত হইয়া ছিলেন। মণিস্তম্ভ নৃসিংহদেবের পিতা বা মাতা বলিয়া কেহ নিশ্চয় করে নাই। লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিঃশ্বাস হইতে মেদিনী উদ্ধারী ভগবান্ বরাহদেবের আবির্ভাব বলিয়া ব্রহ্মাকেও বরাহ-

দেবের পিতা মাতা বলা হয় নাই। যদি বল এই মণিস্তম্ভ এবং ব্রহ্মার অধিষ্ঠানে আবির্ভাব, ইহারা উদরে ধারণ করিলে নিশ্চয় পিতা মাতা হইতেন। তাহাও নয়—উত্তরাদেবীর গর্ভস্থ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়া আবার বাহিরেও আসিলেন তাহাতেও উত্তরার পুত্র বলিয়া কেহ শ্রীকৃষ্ণকে বলে না। ইনি আমার পুত্র এইরূপ অভিমানময়ী প্রীতি যাঁর অন্তরে ভগবান্ তাঁহারই পুত্র। আজ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে আমাদের এই কথাটী ভুলিলে চলিবে না যে, বসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেও গাঢ় প্রেম সম্পত্তি যাঁহাদের সম্বল সেই গোপ-গোপী নন্দ-যশোমতীই শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইয়া আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিলেন। মথুরায় জন্ম হইলেও ভগবানের আনন্দলীলার পরম ধাম শ্রীবৃন্দাবন। গোপ-গোপী বৃন্দাবনবাসী সকলের জয় হউক। ইঁহাদেরই প্রেমের টানে পরম আকর্ষণময় হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আজ **নন্দনন্দন**। (পঞ্চায়েৎ)

ভিক্ষা

(শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য, পুরাণরত্ন।)

মাথায় ক'রে দাও বহিতে
তোমার দেওয়া দুখ।
বুকে ক'রে দাও সহিতে
তোমার দেওয়া সুখ॥

করযোড়ে দাও লইতে
তোমার আশীর্ব্বাদ।
প্রসাদ কুসুম সৌরভেতে
ঘুচুক পরমাদ॥
তোমার স্মৃতি হৃদয় মাঝে
সদাই জেগে থাক।
তোমার দরশ পরশ নিতে
পরাণ ছুটে যাক॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ

(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস, বি, এ।)

শান্তিপুর-বাসিগণের অশেষ সৌভাগ্য ফলে শান্তিপুরনিবাসী দানশীল ও পুণ্যকর্ম্মা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মৈত্র মহাশয়ের ভবনে বিগত ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রায় সপ্তাহকাল মহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই অশেষশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিতের শান্তিপুরে শুভাগমন নিরর্থক হয় নাই। তিনি ছয় দিবস কাল সন্ধ্যাকালে নিয়মিতরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত "রাসলীলা" ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার স্বরূপ ব্রজসুন্দরীগণের অপার্থিব প্রেম এবং প্রেমভক্তির প্রাধান্য বিষয়ে তিনি শাস্ত্রসম্মত যে সুললিত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার শ্রীমুখ বিগলিত অমৃতধারা পান করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয় কেবল শাস্ত্রজ্ঞ নহেন। তিনি ভক্তচূড়ামণি ও সাধকশ্রেষ্ঠ। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে আমরা অবগত হইয়াছিলাম "শ্রীমদ্ভাগবত" নামক মহাগ্রন্থখানি মহর্ষি বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ সামগ্রী। এই মহাগ্রন্থের গূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যে কোন পণ্ডিত ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। বিশিষ্টরূপ সাধন-বল বা ভগবৎকৃপা না থাকিলে এই মহাপুরাণ বুঝিবার উপায় নাই। "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া" প্রাচীন মহাজনগণের এই উক্তি যেরূপ সত্য, দেবাদিদেব মহাদেবোক্ত—

"অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরো সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহ প্রসাদতঃ ॥

এই মহাবাক্যও তদ্রূপ সত্য। আজকাল শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ লইয়া অনেকেই ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাতে গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য যে অনেক সময়ে ব্যাখ্যাত হয় না, শুধু তাহা নহে, উহাতে অপব্যাখ্যা হেতু ঐ অপার্থিব গ্রন্থের মর্য্যাদাও যথাযথ রক্ষিত হয় না।

সাধকোত্তম মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীমুখে আমরা শুনিয়াছিলাম যে, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুই বুঝিয়াছিলেন এবং জীবোদ্ধারের নিমিত্ত তিনি ঐ মহাগ্রন্থের প্রকৃত তত্ত্ব তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত পরমভক্ত রূপ সনাতনাদির দ্বারা জগতে প্রচার করিবারও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বস্তুতই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত মহাপণ্ডিত ও ভক্তগণের আবির্ভাবে এই জগৎ ধন্য হইয়াছে। রূপ ও সনাতনের গ্রন্থাদি বাঙ্গলী জাতির বৈশিষ্ট্য ও গৌরবের পরিচায়ক। ভক্তিভাজন পণ্ডিত মহাশয় ব্যাসাসন হইতে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাখ্যাত ও সমাদৃত হইলেও, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রূপ সনাতনাদির ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া উক্ত গ্রন্থের নিগূঢ় অর্থ যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন

সেরূপ আর ভারতের কোন সম্প্রদায়ই পারেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিবাদিত "অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব" সত্যসত্যই সর্ব্ববিধ দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন। এই তত্ত্ব পরিগ্রহ করিতে পারিলে "অদ্বৈতবাদ" ও "দ্বৈতবাদের" মধ্যে চির প্রচলিত বিবাদ অসন্তোষ চিরদিনের জন্য শান্ত হইয়া যায়। এই তত্ত্বকে তিনি ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত "অদ্বৈতবাদ," আচার্য্য রামানুজ প্রবর্ত্তিত "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" এবং শ্রীমৎ মাধ্বাচার্য্য প্রবর্ত্তিত "দ্বৈতাদ্বৈতবাদ" হইতেও শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিলেন এবং এই "অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব"কেই তিনি সার ও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত মহাশয় দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন যে, বাঙ্গালী জাতির দুর্ভাগ্য যে, বাঙ্গালীর বিদ্বজ্জন অদ্যাপি "কালিদাস" ও "ভবভূতি" প্রভৃতি কবিগণেরই আদর করেন কিন্তু তাঁহাদের ঘরের মহাকবি রূপ সনাতনাদির লিখিত গ্রন্থাদির কবিত্বরস আস্বাদন করিতে যত্নবান হয়েন না। বস্তুতঃ শ্রীরূপ প্রণীত "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ। তথা শ্রীসনাতন প্রণীত "ভাগবতামৃত", কবিকর্ণপুর প্রণীত "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক" এবং শ্রীজীব গোস্বামীর "ষটসন্দভ" প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালী জাতির নামকে চিরকাল উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। বাঙ্গালী হইয়া এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণের যথোচিত সমাদর না করা অতীব দুঃখ ও দুর্গতির বিষয়। প্রত্যেক চিন্তাশীল শিক্ষিত ব্যক্তির শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত প্রেমভক্তির ধর্ম্ম সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণের গ্রন্থাদি যত্ন পূর্ব্বক অধ্যয়ন করা আবশ্যক, একথা বলাই বাহুল্য। যদি কেহ বিশ্বাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত তত্ত্ব জগতের সারধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে চাহেন তবে তিনি কায়মনোবাক্যে ও অক্লান্তভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণের পদাশ্রয় গ্রহণ করুন।

গান

কানাড়া মিশ্র—একতালা।

(শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার চট্টপত্তী।)

এখনও ত ঘিরে আছে রিপুদল আমার কুটীরখানি।
আজও চুপে চুপে ডাকি বাসনারে সোহাগেতে হাতছানি॥
আজও নয়নের হয়নি পিপাসা,
এখনও শেখেনি হৃদি ভালবাসা,
এখনও শ্রবণে নাহি বাঁধে বাসা তব মধুমাখা বাণী॥
তব জয় গান গাহিবার তরে,
(আমার) রসনা এখনও নৃত্য নাহি করে,
তব দ্বারে যেতে আজও দুটী পদ করে কত টানাটানি॥
(আমি) চাইনা ব'লে কি পাবনা তোমারে,
(শুধু) ভেসে ভেসে যাব অকুল পাথারে,
(তুমি) নিজে কেন এসে (আমার) দুটী কাণে ধ'রে,
লহনা শ্রীপদে টানি॥

ছোট-বড়

(শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

ছোট বড় বিচার নিয়ে একটা না একটা যুদ্ধ আমাদের সব সময়েই চলেছে। সবক্ষেত্রেই সেটা লেগে আছে। যে সকল রকমে সত্য সত্যই ছোট; যার যা কিছু সমস্ত ছোট মাপের, খুব নিচু ধাপের ;—সেও

অহঙ্কারে উঁচু গলায় ডেকে বল্‌চে,—"ইস্‌,—আমি ছোট কিসে? ছোট আমার কোন্‌টা? ছোট তোমরাই;—ছোট তোমাদেরই যা কিছু!" অপর, যে ব্যক্তি আপনাকে একটু বুঝে, আপনাকে 'বড়' বলে ঘোষণা কর্‌তে পার্‌চে না সেও, মনোধর্ম্মের নানারূপ যুক্তিতর্ক নিয়ে, 'বড়' যা-নিয়ে 'বড়', তার সেই উচ্চ বিষয়কে "কিছু-না"—"যাচ্ছেতাই"—প্রমাণ ক'রে দিয়ে, তাঁকে আপনার ধাপে টেনে নামিয়ে বসাতে প্রাণপণ চেষ্টা করচে। আর এক রকমের ভয়ানক 'ছোট', কোনদিকে কিছু সুবিধা করতে না পেরে, বড়র ছদ্মবেশে আপনাকে বেমালুম্‌ লুকিয়ে বেশ ইন্দ্রিয় সেবা করচে। তাদের কুহকে কত অবোধ লোক যে বঞ্চিত হ'চ্চে,—বিপদে পরচে তাহার সীমা নাই।

বড়র দিকেও বৈচিত্র্য আছে। যাঁরা প্রকৃতই বড়; যাঁরা সমস্ত লোকের পূজার বস্তু; তাঁদের ভিতর কোন মার পাঁচ নাই;—তাঁরা নির্ম্মল;—তাঁরা নির্ম্মৎসর;—তাঁরা স্ব-মহিমায় সমুন্নত,—দ্বন্দ্বাতীত,—সমস্ত অবিচার অত্যাচারের সম্পূর্ণ অতীত। তাঁরাই জগতের সাক্ষাৎ মঙ্গল স্বরূপ। অখিল-জন-মঙ্গল শ্রীভগবান্‌ তাঁদের ভিতর দিয়েই সমগ্র জীব-জগতের নিত্য কল্যাণ সাধন করেন। এঁদের অনেক দূর নিচে, নিতান্ত মায়িক লোকের বিচারে, অপর যে সব 'বড়',—কুলে মানে ধনে বলে বা বিদ্যায়,—বড়ত্বের গৌরবে তাঁরাই বেশ একটু কটমট,—বিকট,—অনেক স্থলে উৎকটও! এঁরা ওতেই, 'বড়' হ'য়েও, প্রকৃত ছোটই। ছোটকে এঁরা ছোটই দেখেন্‌। ছোট রাখ্‌তেই চান্‌। ছোট ব্যবহারও করেন; সময়ে,—স্বার্থে—ষোল আনা ইন্দ্রিয়-সুখে—একটু ব্যাঘাত—একটু আঘাত হ'লেই, 'মুখছুটো'ও করেন। এই জন্যই ছোটদেরও দ্বেষ দ্বন্দ্ব দৌরাত্ম্য এঁদের উপরেই।

যুদ্ধ চল্‌চে সব রকমে এই দুই তরফে। তা' না হ'য়েই পারে না।

আর একটু এখানে জানিয়ে দে'ওয়া খুব দরকার।—এই 'ছোট', এই 'বড়',—এই 'এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো' দুই রকম জাত,—এই 'এক ধনের অভাবে নিঃস্ব' দুই রূপ 'দুনিয়ার সং,'—এঁদের দু' তরফ হ'তেই, একটা না একটা উদ্ভট খেয়ালের বশে, অথবা কোন না কোন কল্পিত ক্ষতির প্রতিবিধিৎসার উন্মাদনায়, ঐ প্রকৃত বড়'র প্রতি আক্রমণটা অল্পাধিক মাত্রায় আছেই।

এ'র কারণ দু'দিকে দু'রকম। ছোটরা—সব রকমে ছোট ব'লেই তাদের ঘটে পুঁজি অল্প ব'লেই—ওঁদিকে (ঐ প্রকৃত বড়দি'কে) ঠিক্ বুঝ্‌তে পারে না। ওঁদের ভাবের গভীরতায় মোটেই প্রবেশ কর্‌তে পারে না। ওঁদিকেও আপনাদের সেই বিদ্বেষ ভাজন বিকট 'বড়'দের সঙ্গে মিশিয়ে এক ক'রে ফেলে। দুঃসঙ্গে মলিন, অতি হীন, দয়ার পাত্র এই ছোটরা জানে না;—ওঁরাই,—ঐ প্রকৃত বড়রাই,—ঐ বিশ্বহিত মহাত্মারাই,—ছোটকে প্রকৃত বড় করবার জন্য,—তাদের অভাব দুর ক'রে তাদিকে পূর্ণ কর্‌বার জন্য,—যা' কিছু কর্‌চেন: এই অশান্তিপূর্ণ অনর্থের রাজ্যে এ'সে, অমর দুর্লভ অমিয়-পসরা মাথায় ব'য়ে বিনামূল্যে বিলিয়ে দেবার জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ কর্‌চেন।—ছোটদের তরফ হ'তে ওঁদিকে আক্রমণের কারণ এই গুলিই—এই বিপরীত বুদ্ধি—এই অজ্ঞান। অন্যদিকের কারণও এইরূপই। তবে, তা'তে একটু বিশেষ আছে। বিষম সেইটাই। তাঁদের কথা একটু খুলে বলি।

তাঁরা (ঐ 'বড়রা') একটু জ্ঞান আছে ব'লে, তাঁদের চোখে কাণে কাজে যা' কিছু আসে, তাকেই ঐ জ্ঞানের মাপকাটিতে মেপে, ঐ জ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করে নিতে চান্। ওতেই সে সব গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, বিশ্বাস্য কি অবিশ্বাস্য তাহা স্থির করেন। ঐ উৎকট ঝোকে তাঁরা তাঁদের সেই মাপযন্ত্রেই, সেই ওজন দণ্ডেই অপ্রাকৃত অমেয়

বস্তুকেও মাপ্‌তে যান্‌। আর তাতেই তাঁদের অবাধ ইন্দ্রিয়-সেবার পথে, ধর্ম্ম নামে অধর্ম্ম প্রচার পথে, সংস্কার নামে সর্ব্বনাশের পথে, অক্ষয় অন্তরায় স্বরূপ—সেই প্রকৃত বড়—সেই বিশ্বহিত সাধু মহাত্মাদিকেও বুঝে নিতে গিয়ে বঞ্চিত হ'ন্‌। বালকের খেলার লাল্‌বাড়ী দিয়ে সাগর মাপার মত এই অদ্ভুত প্রয়াস সর্ব্বথা ব্যর্থ না হ'য়ে আর কি হ'বে? শ্রীনীলাচল ধামের সেই বিশ্ববিজয়ী পণ্ডিত সার্ব্বভৌমেরও এইরূপ প্রয়াস একদিন ব্যর্থ হ'য়েছিল। বঞ্চিত হ'য়ে বলে'ছিলেন,—"এই কলিতে কি আর তিনি আসেন? এমন কি হয়?—এ' তা' নয়!"—এই অতি ভয়ানক মেপে লওয়া বুদ্ধি দ্বারাই বুঝ্‌তে যেয়ে, ঐ প্রকৃত বড়কে বুঝ্‌তে না পেরে, উল্‌টো বুঝে, তাঁকে দ্বেষ করেন্‌, ঐ বিকট—ঐ উৎকট 'বড়'রা। এ তরফের আক্রমণের বিশেষ ও বিষম কারণ এইটাই।

এইরূপে, প্রাকৃত, ত্রিগুণ-বিচিত্র ছোট ও বড়দের মধ্যে, বড়ত্বের দাবী, বড়ত্বের সুযোগ সুবিধা নিয়ে দ্বন্দ্ব;—আর তাঁদের উভয়ের দ্বারাই প্রকৃত যে বড়—অপ্রাকৃত গুণাতীত যে বস্তু—তৎপ্রতিও বৃথা আক্রমণ, অনিষ্ট চেষ্টা অবিরত চলেচে। এতেই সকল দিকে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'তে বসেচে। খড়কুটীর কাম্‌ড়াকাম্‌ড়িতে মেতে আমরা পরম শ্রেয়ঃ, পরমার্থ হ'তে, কি ইহকাল কি পরকাল—উভয় দিকেরই শান্তিসুখ হ'তে বঞ্চিত হ'চ্চি।

এখন যথার্থ শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিকে ঐ প্রকৃত বড়র আশ্রয় নিয়ে, ঐ ভ্রান্ত পথগামী আত্মঘাতী 'ছোট' ও 'বড়' উভয়কেই শুদ্ধভাবে গড়ে নিতে হবে। আমাদের প্রকৃত মঙ্গল, প্রকৃত উন্নতি, প্রকৃত উদ্ধার এঁতেই। প্রকৃত গঠন কার্য্য ইহাই;—সর্ব্বজন হিতৈষী সজ্জনের পরম-জীব-দয়ার নিত্যানুষ্ঠান ইহাই।

অদ্য আমারা এইস্থলেই বিদায় নিলাম্‌। অতঃপর এইরূপ গুরুতর বিষয়ের ক্রমে ক্রমে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

আগমনী

পরজ বাহার—ঝাঁপতাল

(ডাঃ শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ চন্দ্র।)

আনিবে কবে গিরিজায় গিরিশ তব ভবনে।
ভাবিত নহেত ভব ভবানীর আগমনে ॥
জননী সকাশে আসা শিবানীর বড় আশা।
ভূধর তুমি ভরসা আনিতে সে প্রাণধনে ॥
যাও যাওহে অচল বিলম্ব কি হেতু বল,
পরাণ বড় বিকল না হেরিয়া ত্রিনয়নে ;—
কৈলাশ শিখর পরে হেরিলে শশিশেখরে।
সাদরে বলিবে তারে আগমনী বিবরণে ॥
অনুকূল হ'লে হর প্রতিকূল কে ধরাধর,
ভয়াকুল কলেবর স্মরণে স্মর নিধনে ;—
বিবস যদি সে রসে আশুতোষ যোগবসে
শিবরাণী হিমবাসে আসিবে বল কেমনে ॥
তাই বলি হে গিরিবর বিন্দুপুরে বসে হর,
জাগিবে সে যোগীবর রক্ত-সতী পরশনে ;—
হবে না উমারে আনা সেত কভু আসিবে না।
হবে শুধু আনাগোনা ত্রিনয়নী কৃপা বিনে ॥

বৈষ্ণব-সংবাদ ও মন্তব্য

ভক্তি-সম্পাদক মহাশয়ের অনুপস্থিতির দরুণ এবং শারদীয়া পূজায় ছাপাখানা বন্ধথাকায় ভাদ্র ও আশ্বিন দুই মাসের পত্রিকা একত্রে বাহির করিলাম। ভিঃ পি করিলে গ্রাহকগণের খরচা বেশী হয় বিশেষতঃ এখনও অনেকে বার্ষিক মূল্য মণিঅর্ডারে পাঠাইতেছেন সেইজন্য আমরা বর্ত্তমান সংখ্যাও ভিঃ পি করিলাম না, এখনও যাঁহারা ভক্তির বার্ষিক মূল্য পাঠান নাই, তাঁহারা এই সংখ্যা পাইয়াই নিজ নিজ দেয় মূল্য ১।০ দেড়টাকা মনিঅর্ডারে পাঠাইবেন, যাঁহাদের মূল্য না পাইব আগামী সংখ্যা তাঁহাদিগকে ভিঃ পি করা হইবে। মনিঅর্ডারের কুপনে নূতন বা পুরাতন সকল গ্রাহকই নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন, অনেকে কুপনে নাম ঠিকানা না দেওয়ায় বিশেষ অসুবিধা হয়। পুরাতন গ্রাহকগণ নিজ নিজ গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

* * *

সিমলা হরিসভায় ও দিল্লী হরিসভায় এবার যথাক্রমে ছয়দিন ও দুইদিন লীলা-মিলনী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বক্তৃতা ও গান সহযোগে "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ লীলা" ও "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-লীলা" দেখান হইয়াছে। বিদেশে ভিন্ন ভিন্ন রুচির লোকও যেভাবে লীলা আস্বাদনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যথার্থই উপভোগ্য। বক্তা শ্রীযুক্ত অনাথ বন্ধু ভট্টাচার্য্য পুরাণরত্ন মহাশয়ের প্রচার কার্য্যে উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়।

* * *

"ভক্তি"র ৩১শ বর্ষ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হইয়া "ভক্তি"র একনিষ্ঠ পাঠকগণের অনেকেই অভিনন্দন পত্র (আমার মতে আশীর্ব্বাদপত্র) পাঠাইয়াছেন। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা সহকারে সকলের আশীর্ব্বাদ পত্রই মস্তকে ধারণ করিলাম। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার

প্রাণ সদৃশ যত্নের নিধি "ভক্তি"কে আমি অকপটে সেবা করিতে পারি। দেশের দুর্দ্দিনে দশের দুর্দ্দশা অনেক দেখিতেছি, তদপেক্ষাও দুর্দ্দশা দেখিতেছি ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামী, জানি না একথাটী বলিয়া আমি অপরাধী হইলাম কি না। আমি চাই—শুধু আমি কেন অনেকেই বোধ হয় চান যে, মনেওমুখে একভাব হউক। "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" বোধহয় কেহই পছন্দ করেন না। বড়ই দুঃখের বিষয় আমার সম্প্রদায়ের মধ্যেও এভাবের কিছু কিছু আভাষ পাইতেছি। বিশেষ ব্যথিত হইয়া আমার জনৈক বন্ধু কয়েকটী সত্য ঘটনা বলিয়া যাহা আমাকে প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন আমি উহার কোন কোনটী সত্য জানিয়াও ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ-হানিকর বলিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। লেখক বন্ধুবর আশাকরি সেজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার মনেহয় পত্রিকায় প্রকাশ না করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগত ভাবে একটু সতর্ক করিয়া দিলেই ভাল হয়।

* * *

এতদিন পরে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর নাট মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছে সংবাদ পাইয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্য পরম পূজ্যপাদ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় যেরূপ অসুস্থ হইয়াছিলেন তাহাতে আমরা ভাবিয়া ছিলাম আর বুঝি কিছু হয় না, কিন্তু তাঁহার প্রাণের প্রাণ শ্রীসম্মিলনী যে তাঁহাকে উপস্থিত রাখিয়া এই শুভকার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইতে পারিলেন ইহাতে সম্মিলনীর উদ্যোক্তৃবর্গের কর্ম্ম-কুশলতারই পরিচয় পাওয়া গেল। আশা করি অচিরেই আমরা নাট মন্দিরের সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে দেখিতে পাইব।

* * *

স্থানাভাববশতঃ আমরা কয়েক বৎসরের পুরাতন "ভক্তি" অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি, বিশেষ বিবরণ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

— ——

না বুঝি ধরিতে চাঁদ করে আস্ফালন
তাঁদের অতিক্রমে চেষ্টা তোদের তেমন !
শুনি কর্ণ প্রপীড়ক সুস্পষ্ট বচন
"সাধু ! সাধু !" শব্দ মাত্র করি উচ্চারণ
নিরস্ত হইলা সবে ; কিন্তু অন্তরেতে
ভূগর্ভস্থ বহ্নি যেন লাগিল জ্বলিতে ।

*　　　　*　　　　*

হেথা নিমাইয়ের ভাব উত্তর উত্তর
বাড়িতেছে ; সরসীতে কমল কোরক
ধীরে ধীরে উষাগমে প্রস্ফুটিত যথা ।
মধুর সৌরভ তার যেমন ডুবায়
মৃদুল অপর গন্ধ, হেন নদীয়ায়
যশভাতি অপরের আবৃত তেমতি ।
যেমন বিদ্যুতালোক জ্বলিলে আগারে
নিমেষে মৃন্ময় দীপে প্রভাহীন করে,
তেমতি যতেক স্মার্ত্ত নৈয়ায়িক সবে
ম্রিয়মান হ'য়ে গেল নিমাই প্রভাবে ।
ভক্তের গৌরব আর ভক্তির মহিমা,
লক্ষকণ্ঠে উচ্চারিত হইতে লাগিল ।
তান্ত্রিকেরা চক্র বসাইয়া সংগোপনে
ভেদাচার বিদূরিতে নারিল যতনে ;
নিমাইর মাত্র এক অঙ্গুলী হেলনে
সেই ভেদাচার ত্রস্তে পলাইল ত্রাসে ;
তপন উদয়ে যথা তমঃরাশি নাশে ।

কাজেই তান্ত্রিক এক জ্বলিয়া হিংসায়
করিল মন্ত্রনা দিতে প্রতিফল ; হায় !
এ জগতে মানবের একি দুর্ব্বলতা !
সহিতে না পারে অপরের তৎপরতা,
অথচ সদম্ভে করে আত্ম প্রকটন
সদা সহৃদার বলি'। করে অকারণ
অপরের যশে ঈর্ষা ঘৃণা প্রদর্শন
পরশ্রীকাতর অন্ধ, উলুকের যেন
নয়নে অসহ্য হয় ভানুর কিরণ।
স্থূলকথা—উদারতা ক্ষুদ্রচেতা নরে
ততক্ষণ সগৌরবে বিঘোষিত করে,
নিজ স্বার্থে না পড়ে আঘাত যতক্ষণ ;
বাক্যে কার্য্যে সুকঠিন সমতা রক্ষণ !

হেথা অনুরক্ত ভক্ত নবদ্বীপ ধামে
আসি মিলিতেছে সবে ক্রমে ক্রমে ক্রমে ;
জাহ্নবীর বারি বৃদ্ধি যেন বর্ষাগমে।
পবন সহায়ে তুলি তরঙ্গ যেমন
সুরধুনী করে নৃত্য, সঙ্কীর্ত্তনযোগে
তেমতি ভকত মত্ত নর্ত্তনানুরাগে।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি—"হরি ও রাম
গোবিন্দ গোপাল বনমালী রাধে শ্যাম।"
কীর্ত্তন-সাগর যেন ক্ষোভিত হইয়ে
তুলিল তরঙ্গ ভীম, দিল ভাষাইয়ে
নবদ্বীপ, আপ্লাবিত করিয়া সবায় ;

তবে সে তরঙ্গ রঙ্গে শান্তিপুরে ধায়,
ডুবু ডুবু শান্তিপুর * প্রেমের বন্যায়।
সে তরঙ্গে উদ্ধত উরগ নদীয়ায়
যা'দের গরল ভয়ে নর নারী চয়
সন্ত্রস্ত—ভাসিয়ে গিয়ে দেবত্ব লভয়;
জগাই মাধাই দুই মহাভক্ত হয়। +
ঝঞ্ঝাপ্রায় সমাগত দিগ্বিজয়ীবর
কেশবের পরাজয়ে পণ্ডিত নিকর
নদীয়ায় হ'য়েছিল বিস্মিত যেমন,
এ দুহার পরাভবে আপামর জন
ততোধিক চমকিত; সিংহ সুভীষণ
যাদুমন্ত্রে নিমেষেতে মার্জ্জার আকার!
নেহারিয়া, শঙ্কাভয় ঘুচিল সবার।
সে তরঙ্গ তেজ বৃদ্ধি উত্তর উত্তর,
ভাসাইয়া দিল তায় মত্ত করীবর;
যথা ঐরাবত দন্তী জাহ্নবী প্রবাহ
রোধিবার তরে শিরে ধরিল নিগ্রহ।
নদীয়ার কাজি গর্ব্বী রাজশক্তিধর
সহজে বৈষ্ণব দ্বেষী, তায় পণ্ডিতের
কেহ কেহ অভিযোগ করিল উৎসাহে
করিবারে মানা, কাজি রোধিলা কীর্ত্তন;
অমোঘ অমৃত স্রোত শান্তির নিদান।

---

* শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহ।

\+ শান্তিলতাকাব্যে ইহাদের উদ্ধার বার্ত্তা বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু হায় সনাতন নীতি হীনতায়
ফলিল বিষম ফল, হ'ল উচ্ছ্বসিত
অবরুদ্ধ স্রোত—যথা তরঙ্গে তরঙ্গে
চলে মহাজলরাশি নাচিয়া নাচিয়া
গরজিয়া মহাসিন্ধু পানে মহাবেগে।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি, সহস্র মশাল
জ্বলিয়া উঠিল ; যেন পাপতমজাল
বিনাশিতে একেবারে। মৃদঙ্গের রোল
বধির করিল কর্ণে যত বিরোধীর ;
নাচিয়া উঠিল কৃষ্ণভক্ত নগরীর।
নাচে যথা শিখীকুল পুচ্ছপ্রসারিয়া
যবে গগনেতে ঘন সঘনে গরজে।
কাজির সে দম্ভ গর্ব্ব নিষ্প্রভ হইল
সগণে স্পর্দ্ধিত কাজি দলিত হইল। §
ঝটিকা দাপটে দীপ হলে নির্ব্বাপিত
নিমিষে আলোক রেখা আকাশে যেমন
মিশাইয়া যায় ; তথা শেষ আশা ক্ষীণ
বিরোধীর মিলাইল, হৃদয় কন্দরে
করি আবরিত অনুৎসাহ অন্ধকারে।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি, হরি নামামৃত
আপ্লাবিয়া দশদিক হ'ল বরষিত।
ভণ্ড পাষণ্ডের চিত তাতে না তিতিল।

§ শান্তিলতায় 'দলন' নামক ৫ম সর্গ ও শ্রীচৈতন্যভাগবত দ্রষ্টব্য।

যথা যবে অবিরল ধারা শ্রাবণের
ধরায় বর্ষিত ; তায় নারে ডুবাইতে
পশিয়া আয়াসে কোন আবরিত স্থানে।
হিংসা, দ্বেষ জর্জ্জরিত কঠিন পরাণ
সহজে না হয় দ্রব—পাষাণ কঙ্কর
কেবা কোথা দেখিয়াছে হইতে উর্ব্বর ?
নহে সে বিচিত্র, তাই বিরোধীর দল
সদম্ভে একত্রে তারা মিলিবে সকল।
ঈর্ষা-বিষে জ্বলি তারা পরামর্শ করে
প্রহারিতে প্রেম মন্ত্র প্রচারকে ধরে' !!
পশিল এ জনরব নিমায়ের কাণে
ব্যথিত হইল প্রাণ তাহার কারণে ;
ঝরিল অজস্র অশ্রু কমল নয়নে।
হায় বিদ্যা ! তোমার সেবকগণ যদি
নীতি আর ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত হয়,
ভূষণ না হয়ে তুমি হও গো দূষণ ,
দুগ্ধপানে সর্পে যথা বিষের বর্দ্ধন !
কি গভীর কৃষ্ণমেঘ ছাইল গগনে,
ঝরিল করুণাবারি নিমাই নয়নে।
হায় নর ! তোমাদের পাপ সুভীষণ
বিনাশিতে যত্ন যাঁর, তাঁর প্রতি হেন
হীন আচরণ তব ; মরি কিবা লাজে !
হায় রে প্রতপ্ত নর ! হিংসা-বিষ-তাপে
হ'তে চাস দগ্ধ ?—বিদ্যা অভিমানে ধিক্ !

হায় নর! যে মহামানব হিতে তব
সতত প্রয়াসী-ব্রতী-হিংসা বিবর্জ্জিত;
হিংসিলে তাঁহারে, হিংসা না স্পর্শিয়ে তাঁরে
শতগুণ তীব্রতেজে দংশিবে তোমারে।
হিংসাবিষ ঢালিতেছ তুমি যার তরে,
—সে না জানে—শান্ত—তাঁর চিত্ত আবরিত;
তাই তব হিংসা তথা প্রবেশিতে নারি
ফিরিয়া করিবে বাসা হৃদয়ে তোমারি।
যথা বিদ্যুতাদি যত প্রবল শক্তির,
শক্ত্যাধার-যন্ত্র* হ'তে শকতি নির্গত
হইলে, আবার ঘুরি হয় প্রত্যাবর্ত্ত
পুনঃ সে আধারে। কিম্বা পুরাণে বর্ণিত
ব্রহ্ম অস্ত্র চিত্তজয়ী মহতে নিহত
করিতে প্রযুক্ত হ'লে, হইয়া প্রহৃত
পূর্ণতেজে প্রযুক্তারে মারে উলটিয়ে;
অম্বরীষ উপাখ্যান আছে সাক্ষি হ'য়ে।
শাস্ত্রবাক্য † তাই—মহতের অতিক্রমে
আয়ু যশ শ্রী সমৃদ্ধি দ্রুত ধ্বংস পায়,
সমীর সঞ্চারে যথা কর্পূর মিলায়।

---

* Dynamo.

† আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এবচ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমেঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত।)

ঈশ্বরেতে অপরাধ আরো শোচ্য হয়,
জন্মে জন্মে জ্বালা নিয়ে অসুরে জন্মায় ;
প্রকৃতির কি ভীষণ হয় বিপর্য্যয় !

হায় নর ! যে লীলাপুরুষ প্রেমাধার,
প্রেমে বিভাবিত তনু ; অপ্রেমের ছায়া
হেরিলে সে যায় যেন দুঃখে মিলাইয়া।
সকাতরে চায় সে যে সবারে শোধিতে,
লইয়া সবার পাপ আত্মবিসর্জ্জিতে !
তাঁরে হিংসা !! নরত্বের কিবা পরিণতি।
শোচনীয় !! —কিবা ঘোর কলঙ্ক-মণ্ডিত !!
কিন্তু হায় ! নর-কুল কুলাঙ্গার যারা,
বুঝিবে না কভু তারা ;—চোরা নাহি শুনে
ধর্ম্মের কাহিনী,—তবে হিংসিবে নিশ্চিত ?
তাতেও তোদের তিনি বাঞ্ছিবেন হিত।

ঐত নিমাই হায় ! হ'য়েছে ব্যথিত,
মানবের গ্লানি চিন্তি' সে শান্ত অন্তরে,
কি তপ্ত ঝটিকা বহে, কে বুঝিতে পারে ?
তীব্র সে তাপের তেজে সোণার পুত্তলি,
বহ্নিতাপে নবনীত প্রায় গেছে গলি !
দুঃখে দৈন্যে মজি,' হিত বাঞ্ছিয়া সবার
কি গভীর ভাবমগ্ন শচীর কুমার ?
ধীরে ধীরে হেরে পরে করুণ নয়নে
অকস্মাৎ এ কি বাণী ফুটিল বদনে ?

"করিল পিপ্পলী খণ্ড কফ নিবারিতে,
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে।" (শ্রীচৈতন্যভাগবত।)
শুনি ভক্তগণ বাণী চকিত স্তম্ভিত,
স্তম্ভিত ত্রিজগত; প্রশান্ত সুস্থির,
ঝটিকার পূর্ব্বে যেন ভাব প্রকৃতির!

তৃতীয় সর্গ

আকুলতা।

ধীরে ধীরে ধীরে বহিছে সমীর
ধীরে ধীরে মেঘমালা
আকাশের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া
চতুর্দ্দিক আবরিলা;
প্রান্ত হ'তে প্রান্তে ছুটে ইরম্মদ*
ঝলসিয়া দিক ধাঁধিয়া আঁখি,
পবন স্বনন স্বন স্বন স্বন
প্রলয়ের কাণ্ড বাঁধিবে না কি?
বিধির বিধানে সব সমাধান,
বিধির বিধানে পবনে
উড়াইতে পারে ঘন ঘনরাশি
হাসাইতে পারে গগনে।

---

*ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি।

সুবিমল নভঃ নিভ নিমাইর
প্রশান্ত হৃদয় আকাশে
উঠেছিল যেই মেঘ আচ্ছাদিয়া,
কাটিবে কীর্ত্তন নির্ঘোষে ?
যেদিন বলিলা সুগভীর ক্ষোভে
'বাড়িয়াছে কফ' দুরন্ত
সেদিন হইতে সদায় কীর্ত্তন—
ভাব ও আবেশ অনন্ত।
দ্বিপ্রহর পরে কভু একে একে
ভক্তগণ আসি মিলিত,
একে একে ফুটি তারাদল যেন
চারু চন্দ্রমাকে ঘেরিত।
কৃষ্ণকথা কথা হইত যখন,
'কৃষ্ণ' 'ধ্বনি কাণে পশিতে
না পশিতে অঙ্গ যেত এলাইয়া
বিচেতন হত ভাবেতে।
ভয়ে পরিকর কৃষ্ণের প্রসঙ্গ
না করি কীর্ত্তন ধরিত।
'কীর্ত্তনৈক পিতা' গৌর সুন্দর
পেয়ে পুত্র-সঙ্গ মাতিত।
সংকীর্ত্তনে ভাল থাকিত নিমাই,
সচেতন দেখা যাইত।
অন্যথায় কি যে ভাবঘোরে মগ্ন !
সে গাম্ভীর্য্যে ভয় জন্মিত।

নিবাত নিষ্কম্প প্রকৃতি প্রগাঢ়
ঘনে ঘনীভূত মুখ,
নিরখিলে কি যে প্রচ্ছন্ন শঙ্কায়
কেঁপে উঠে ত্রাসে বুক।
তাই ভক্তগণ শচীগৃহে গিয়ে
কীর্ত্তন সদায় যুড়িত,
শচীও সে ভাব অনুকূলে থাকি'
উচ্চ বাচ্য নাহি করিত!
নিশীথে প্রয়াশঃ সমাপি ভোজন
সাঙ্গ পাঙ্গ সঙ্গে করিয়া
শ্রীবাস অঙ্গনে প্রবেশি সুরঙ্গে
রহিত কীর্ত্তনে ডুবিয়া।
শ্রীবাসের দ্বারে পড়িত কপাট
বহিরঙ্গ যেতে নারিত।
কীর্ত্তনের স্রোতে সবাই ভাসিত
হিল্লোলে হিল্লোলে দোলিত।
সে সিন্ধু-সলিলে উল্লাস বিলাস
উল্লম্ফন খেলা চলিত,
লক্ষ্য না রহিত কত কাল যেত
প্রেমানন্দে মাতি থাকিত।
কভু বা ভোজন বিনে সম্পাদন
শ্রীবাস ভবনে পশিত,
প্রসাদ রাখিয়া যত্নে আবরিয়া
প্রতিক্ষায় 'প্রিয়া' থাকিত।

সহৃদয় গোরা আসিতে সেদিন
গৃহে না বিলম্ব করিত ;
পাইয়া প্রভুকে ‘প্রিয়ার’ পুলকে
প্রতি তনু নেচে উঠিত।

* * *

গৃহেতে আসিতে হইলে বিলম্ব
বিচলিতা সবে হইত,
সখীজন সহ সনাতন সুতা
প্রাণে কি বেদনা পাইত।
তবে শচীমাতা হইয়া চিন্তিতা
বসিত আপন দুয়ারে,
আসিয়া মালিনী শ্রীবাস গৃহিণী
নিয়ে যে’ত তাঁরে ভিতরে।
হেরি নিমায়ের ভাবের গাঢ়তা
নদীয়ার নারী-সমাজে
আলোচনা আর চলিল জল্পনা ;
নারীচিত্ত দ্রবে সহজে।
পুরোহিত* পত্নী রত্নমালা দেবী
আসে সুলোচনা,† শর্ব্বাণী,

* শ্রীবিশ্বম্ভরের পুরোহিতের নাম সুদর্শন পণ্ডিত।

† শ্রীবিশ্বম্ভরের গুরুপত্নীর নাম সুলোচনা দেবী।

আসিলেন ছিরি,* আর নারায়ণী,†
চন্দ্রকলা বংশীজননী।‡
প্রদোষের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে যথা
ক্ষীণপ্রভ ফুটে তারকা,
শচীর অঙ্গন ভাতিল তেমতি
—দিতে উপদেশ আকাঙ্ক্ষা।
শচীরে ঘেরিয়া সকলে বসিয়া
দিলেন সান্ত্বনা যতনে,
হ'ল পরামর্শ নারী সবে মিলে
রাখিবে স্বগৃহে কীর্ত্তনে।
গৌর ঘরনী জননীর পাশে
নিশীদিন বসি রহিত;
চন্দ্রমা যেমন ধরণীর ধারে
বিরাজিত থাকে সতত।
সঙ্গীত যেমন ভেসে ভেসে এসে
ঢালে সুধারস শ্রবণে,
তেমনি তেমনি শুনি সেই বাণী
খেলিল পুলক পরাণে।
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ সুচিত্রা কাঞ্চনা
হরষিতা বাণী শুনিয়া,
সব সখীসনে বিকসিত প্রাণে
করে সংকীর্ত্তন মিলিয়া।

---

* অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পত্নীর নাম শ্রী।
† শ্রীগৌরাঙ্গের ধাতৃমাতার নাম নারায়ণী। (অপর নাম ক্ষেমঙ্করী।)
‡ ছকড়ি চট্টের পত্নী—বংশীবদন জননীর নাম ছিল চন্দ্রকলা দেবী।

তখন—

"পুংস্কোকিল স্বর মনোহর কণ্ঠনাদাঃ
সমন্দিরা যুগ বিভূষিত পাণিপদ্মাঃ ;
উচ্চৈর্জগুঃ সপদি নৃত্যমবেক্ষ্য তস্য
হৃষ্টাঃ প্রমোদ মধুরং পুলকা কুলঙ্গাঃ ।"
(শ্রীকবিকর্ণপুরকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে।)

নিত্য নবদ্বীপে মধুর কীর্ত্তন
রাস নৃত্য মহোৎসব ;
নবদ্বীপ এবে নব বৃন্দাবন
সেই সখা সখী সব ।
গৌরহরি মত্ত সংকীর্ত্তন রসে
বিভোর সতত কি যে মোহবশে !
সে রসে মাতিয়া সংকীর্ত্তনে পশে,
কি প্রচেষ্টা অভিনব !
বালা বিষ্ণুপ্রিয়া না পায় দর্শন,
অহরহঃ তাঁর বিরস বদন ;
উপায় সৃজিল তাই সখিগণ
মিলিলা একত্রে সব !
দিয়া উলুধ্বনি পশিলা অঙ্গনে
লইলা মন্দিরা করে ।
কুসুম সমূহ যেন বা উদ্যানে
হেলে দোলে বায়ুভরে ।
দ্বিজাঙ্গনাগণ করে সংকীর্ত্তন
কি মধু সুকণ্ঠ ! কি স্বর কম্পন !

বায়ুস্তরে ধীরে উঠিল নিক্কণ,
অম্বর ভরিল স্বরে !

গৌরাঙ্গ সুন্দর ছিল অন্য মনে
বামা কণ্ঠে মধু সংকীর্ত্তন শুনে
ধৈর্য্য হারাইয়া ধাইল অঙ্গনে ;
গাইল কি প্রেম ভরে !

নারিল যাইতে শ্রীবাস অঙ্গনে
রহিল আপন গেহে ;
মহারাস আজি শচীর প্রাঙ্গনে
চরাচর মুগ্ধ তাহে ।
ভরিল আকাশ দিব্য তেজপুঞ্জে
বিকচ নলিনে অলিকুল গুঞ্জে
কূজনিছে পিক কুসুমিত কুঞ্জে
সমীরণ মৃদু বহে ।

আজি বিষ্ণুপ্রিয়া আশা প্রপূরিত,
নেহারিল নেত্র ভরিয়া সে নৃত্য '
নারীরাও প্রেম-পুলকে পূর্ণিত ;
আত্ম পাশরিয়া রহে ।

বলে ভক্ত 'গোরা বাঞ্ছাকল্পতরু,
না রাখে কাঁহারো ক্ষোভ' ;
সেদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে না গিয়ে
গৃহে তাই নামোৎসব ?

নামোৎসব অন্তে পরম হরিষে
শচী-অভিপ্রায় মতে
বিষ্ণুপ্রিয়া যত্নে করিয়া রন্ধন
নিবেদিলা প্রাণ নাথে।
হাস্যোজ্জ্বলা ঐ রজনীর মুখে
প্রিয়া-পরিতোষ তরে
রসিক সুন্দর হাসিয়া হাসিয়া
কহিল আদর ভরে—

"প্লাবিয়া ত্রিদিব ধাম সুধাস্রোত ওই
আসিছে ধরায় ;
কে গো বরষিছে সুধা পাব তাঁরে কই ?
হেরিব কোথায় ?
অপূর্ব্ব পীযূষ ধারা লহরে লহরে
পাদপ লতায়,
হাসাইছে মাতাইছে নাচাইছে মরি !
কিবা সুষমায় !
বিতরিছে সেফালিকা কুসুম সম্পদ
আনন্দ হিয়ায়,
কামিনী কুসুম কিবা ছড়াইছে বৈভব
আবরি ধরায়।

কেন আনন্দিত সব ? কি উচ্ছ্বাস আহা !
কি উন্মাদনায়

ভরিছে ধরার বক্ষঃ প্লাবিছে অন্তর
কিবা মহিমায় !

হের প্রাণ প্রিয়ে ওই আসিছে ছুটিয়া
কি করুণা জ্যোৎস্নায় !
আত্ম প্রকাশিছে যেন বুঝাইতে নরে—
হরি করুণায়।
কৃষ্ণ অনুরাগে বুঝি সমুজ্জ্বল শশী,
বিগলিত কায় ;
তরলিত দেবদেহ পরশেতে বুঝি
হৃদয় মাতায়।”

নিজ প্রিয়া করে ধরি, জ্যোৎস্না পুলকিতা
প্রোজ্জ্বল নিশায়,
প্রেম-পুলকিত গোরা কহিল আদরে
প্রেমার্দ্র হিয়ায়।

“কি বুঝি রহস্য নাথ” উত্তরিলা বালা—
“নেহারি সদায়,
লাবণ্য লহর খেলি বদনে তোমার
জগত মোহায়।
কি ছার চাঁদের হাসি, কুসুম সম্পদ,
মুখ-তুলনায় !
ত্রিদিব বৈভব তুচ্ছ! মলিন সদায়
অঙ্গের ছটায়।”

১৩০৮ বঙ্গাব্দে
নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

৩১শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

সম্পাদক
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন।

বিনীত নিবেদন

বর্ত্তমানে দেশে দারুণ অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত। ছোট বড় সকলকেই কিছু না কিছু অভাবগ্রস্ত ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। "ভক্তি" পত্রিকার গ্রাহকবর্গের মধ্যে অনেকেই এই কারণে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভক্তির মূল্য পাঠাইতে পারিতেছেন না ইহা আমরা বুঝিতেছি, তথাপি তাঁহাদের প্রদত্ত ভক্তির বার্ষিক মূল্য ১৷৹ দেড়টী টাকাই যে, এই ভক্তি-প্রকাশের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচারের ও একটী প্রাচীন বৈষ্ণব পত্রিকার জীবন রক্ষার প্রধান সহায় তাহা আমরা ভুলিতে পারি নাই, তাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, এখনও যাঁহারা বার্ষিক মূল্য পাঠান নাই একটু চেষ্টা করিয়া এই মাসে উহা পাঠাইয়া আমাদিগের কার্য্যের সহায়তা করুন। ডাক মাশুল বৃদ্ধি হেতু অন্যান্য বারের ন্যায় প্রত্যেককে পৃথক পৃথক অনুরোধ পত্র পাঠাইতে পারিলাম না, সাধারণ ভাবে এই নিবেদন শুনাইলাম।

বিনীত—কার্য্যাধ্যক্ষ "ভক্তি"

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১৷৹ দেড় টাকা
নমুনা প্রতি খণ্ড ৶৹ তিন আনা, ভিঃ পিতে ১৵৹ আনা

সূচীপত্র

সম্পাদক কর্ত্তৃক মাসিক "ভক্তি-নিকেতন" পোঃ আন্দুল-মৌড়ী হাওড়া হইতে প্রকাশিত
ও কলিকাতা ৭৭নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

৩১শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

আত্ম-নিবেদন-গীতি

(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়।)

—:*:—

এবার প্রভু নাওহে তুমি
(আমায়) কাঙ্গাল ব'লে তোমার ক'রে।
(আর) আমি যাবনাক—যাবনাক
আঁধার পথে—তোমায় ছেড়ে॥
তুমি আমার সঙ্গে থাক
দূরে যেতে দিওনাক
(তুমি) জীবনের ধন হৃদয় রতন
রাখব তোমায় হৃদে ধ'রে॥
(আমার) হোক্ না কেন মলিন দেহ—
হোক্ না কেন মলিন প্রাণ,
তাইতে তোমায় বস্‌তে হবে
সে যে প্রভু তোমারি দান ;—
তোমার চরণ পরশ পেয়ে
(আমার) পুলক-ধারা পড়বে বেয়ে

প্রীতির সরস কুসুমগুলি
উঠ্‌বে ফুটে তোমার তরে ॥
(আমার) হৃদয় আসন পেতে দিব,
(এই) নয়ন জলে চরণ ধোয়াব,
(আর) সচন্দন তুলসী পত্র
(তায়) সাজিয়ে দিব থরে থরে ;—
(আমার) নিজহাতে গেথে মালা
(তোমায়) পরিয়ে দিব চিকণকালা
(তুমি) প্রাণের প্রাণ অমূল্য নিধি
দেখব তোমায় নয়ন ভরে' ॥

স্বভাব-চিকিৎসার মূলসূত্র

(শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস এম্‌-এ, বি-এল।)

আত্মাকে মানি আর না মানি, মনকে সবাই মানি। চৈতন্যময় মানুষের বৈশিষ্ট্য মন। মন আছে বলিয়াই আমরা মানুষ। মনের শক্তি ত্রিবিধ,—বোধশক্তি, জ্ঞানশক্তি আর ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তিকে মনন শক্তি বলিতেও পারি।

মনন শক্তি তুচ্ছ অবজ্ঞেয় নহে। মনন শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তির সহিত তুলনা করিতে পারি। বৈদ্যুতিক শক্তির স্বরূপতত্ত্ব আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু তাহাকে আমরা নানাভাবে খাটাইয়া লইতেছি। তাড়িত শক্তি নিমেষমধ্যে দূরের বার্ত্তা বহিয়া আনিতেছে, নগরীকে দীপালোকিত করিতেছে, যন্ত্র চালাইতেছে, ছবি দেখাইতেছে, গান

শুনাইতেছে। বুদ্ধি ও কৌশল সহকারে এই শক্তিকে চালাইয়া আমরা বর্ত্তমান যুগের চিত্তচমৎকার নব নব আবিষ্কারে জনমন মোহিত করিতেছি।

মনের শক্তিও এইরূপ অপূর্ব্ব। তাহার উৎস ও উৎপত্তির ইতিহাস জানি না। দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানের গহন অরণ্যের মধ্যে পথহারা হইয়া লাভ নাই। মনের প্রকৃতি এবং রহস্য না জানিয়াও মনের বিচিত্র শক্তি-মাধুরী অনুভব এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

মনন শক্তিকে পরিচালন করিয়াই যোগসিদ্ধি লাভ হয়। হঠযোগের সংবাদ জানি না, কিন্তু হঠযোগী না হইয়াও মনন শক্তির দ্বারা আরোগ্য লাভ করা যাইতে পারে, তাহাও যোগ—তবে সহজ যোগ। তাহার ভিতর কোনও কারসাজি নাই, কোনও গুপ্ত রহস্য নাই।

প্রথমে চাই মনকে একতান করা। মন বিশৃঙ্খল, বায়ুর মত দ্রুত-গতিতে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মন ছুটিয়া চলিয়াছে। মনকে সংযত করিতে হইবে। চঞ্চল মনকে স্থির ও শান্ত করিতে হইবে। তাহার জন্য অভ্যাস চাই।

গীতায় অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥'

হে কৃষ্ণ! মন বড়ই চঞ্চল, উচ্ছৃঙ্খল, বলবান এবং দৃঢ়! আমি মনে করি বাতাসকে যেমন বশে রাখা যায় না, মনকেও তেমনি সংযত করা যায় না।

ভগবান্ উত্তর দিলেন—

'অসংশয়ং মহাবাহো! মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥'

হে মহাবীর! ইহা নিঃসংশয় যে, মন চঞ্চল এবং তাহাকে সংযত করা অতি কঠিন। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে বশীভূত করা চলে।

মনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে, এই অভ্যাস চাই। একবার ব্যর্থ হই দশবার চেষ্টা করিব, এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।

মনকে সংযত এবং শান্ত করিতে পারিলে অনেক কাজ হইল। শরীর ও মনের পরস্পর নিকট সম্বন্ধ। মন যাহা ভাবে, শরীরে তাহাই আবির্ভূত হয় এবং প্রকাশিত হয়। লক্ষ লক্ষ লোক আজিও যে, ফকিরের জলপড়া, তেলপড়ায় আরোগ্য হইতেছে, তাহার কারণ এই সব লোকের মানসিক চেষ্টা। ইহাতে ইহাদের গভীর বিশ্বাস আছে এবং এই বিশ্বাসই তাহাদের মনকে জাগ্রত এবং শক্তিমান করিয়া তুলে।

ঝাড়, ফুক্ প্রভৃতি চিকিৎসা প্রণালীর ইহাই মূলতত্ত্ব। শাস্ত্রে পাই—

তীর্থে দেবে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥

তীর্থ, দেব, দ্বিজ, মন্ত্র, দৈবজ্ঞ, ভেষজ এবং গুরু, ইহাদের প্রতি যাহার যেরূপ চিন্তা, তাহার সেইরূপ সিদ্ধি হয়।

দেখা যায় যখনই কোন সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হয়, তখন যাহাদের মন দুর্ব্বল, যাহারা ভীতু তাহারাই আক্রান্ত বেশী হয়; সবল এবং দৃঢ়চেতা ব্যক্তি নির্ভীকচিত্তে চলিয়া বেড়ায়। মন তাজা থাকিলে শরীরকে তাজা করিতে দেরী লাগে না, আর মনই যদি ভাঙ্গা থাকে তাহা হইলে শরীরও কিছুতেই সারে না।

মনের শক্তি তাই অসীম। এই মনন শক্তিকে আরোগ্য-মন্ত্র কিরূপে করা যাইতে পারে তাহারই সহজ পন্থার কথা বলিতেছি। ইহাকে

ইংরাজীতে auto-suggestion বলে। ঔষধের চেয়ে এই মানস সঙ্কল্প তীক্ষ্ণবীর্য্য এবং মন্ত্র-শক্তির ন্যায় সমস্ত বাধা বিঘ্নকে অপসারিত করিয়া মানুষকে নীরোগ এবং প্রফুল্ল করিয়া তুলে।

মনকে ধীর স্থির করিয়া মনকে বলিতে হইবে "আমি নিরোগ, আমি নিরাময়, আমার কোনও ব্যাধি নাই।" ধীরে ধীরে মনকে এই সব ইঙ্গিত করিতে হইবে। আমি সুস্থ, আমি সবল, আমি প্রাণবান, আমি শক্তিমান—ভাবিলেই মানুষ শক্তির উৎসের সহিত যুক্ত হয়। ভাবনা যে পরিমাণে আন্তরিক ও যে পরিমাণে সত্য হইয়া উঠিবে সেই পরিমাণে সিদ্ধিলাভ হইবে।

ইচ্ছাশক্তি ভগবৎশক্তি। ইহার ক্ষমতার সীমা নাই। আমরা যতই তাহার প্রয়োগ করিব ততই এই শক্তি পুষ্ট, বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে। যখন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া কোন বস্তু বা ভাব চাওয়া যায়, অভ্যাস করিলে তাহা অনায়াসেই অধিগত করা যায়। চাহিলেও পাওয়া যায়। যে চাহিতে জানে, সে পায়।

বিশ্বাস কর, একান্ত নির্ভরতায় বিশ্বাস কর—তুমি অনন্ত শক্তির অংশ। চাহিলেই সেই শক্তি তোমার সহায় হইবে। একটী ইংরাজী কবিতায় পাই :—

I hold it as a changeless law
　From which no soul can sway or swerve
We have that in us which will draw
　Whate'ver we needor most desire.

অর্থাৎ—আমাদের যাহা প্রয়োজন, কিংবা আমরা যাহা পাওয়ার অধিকারী সেই সবই আমাদের নিজের মধ্যে আছে—ইহাই অলঙ্ঘ্য বিধান, কোথাও ইহার অন্যথা হয় না। শক্তি মন্ত্রের বাণী মিথ্যা নয়। মানুষের

ভিতর ভগবৎশক্তি গুপ্ত রহিয়াছে, সুপ্ত রহিয়াছে, চেষ্টায় ও যত্নে তাহাকে জাগাইতে হইবে।

যে কোনও রোগ হউক না কেন, কোনও নির্জ্জন শুচি স্থানে বসিয়া মনকে শান্ত করিয়া ভাবিতে হইবে "আমার রোগ নাই, আমি সুস্থ, আমি সবল, আমার চিন্তার সহিত আমার পেশীতে পেশীতে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে, আমি ক্রমশঃ শক্তিমান এবং সমর্থ হইয়া উঠিতেছি, আমার দেহ ও মনের প্রত্যেক যন্ত্রই নিয়মিতভাবে কাজ করিতেছে।" তাহা হইলে দেখা যাইবে সত্য সত্যই মন এবং শরীর সেইরূপ করিতেছে।

রেলগাড়ী নানাদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। কত ষ্টেশনে, কতদূরে কতরূপে তাহার স্থিতি; কিন্তু কণ্ট্রোলার আফিসে কেরাণীবাবু কলিকাতায় বসিয়া যেমন তাহার সমস্ত বিধি ব্যবস্থা করিতেছেন, সেইরূপ ভাবে সে চলিতেছে। মনের বেলায়ও সেইরূপ হয়। সমস্ত রেলগাড়ী যেমন কণ্ট্রোলার আফিসের কথা মানিয়া চলাফেরা করে, দেহের সমস্ত বৃত্তি ও শক্তি তেমনই মনের ইঙ্গিতে পরিচালিত। মন যদি বলে, হে দুর্ব্বল পেশী! তুমি সবল, তাহা হইলে সেই পেশী ক্রমশঃই সবল হইয়া উঠিবে। মনন শক্তির ইহাই অপূর্ব্ব রহস্য।

অনেকে এই ব্যাপারকে গাঁজাখুরী বলিয়া হাসিয়া উড়াইতে পারেন, কিন্তু আদপেই ইহা ভ্রমাত্মক নহে। সমস্ত চিকিৎসা-গ্রন্থে মনের এই অসীম ক্ষমতার কথা বলা আছে এবং ভিষককে রোগীর মানসিক শক্তি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে বলা হইয়াছে।

মনোবিজ্ঞানের কথা কিছু তুলিতেছি। অধ্যাপক ষ্টিফেন তাঁহার Psychology পুস্তকে লিখেছেন :—

Suggestion is a force by which precepts and ideas present in consciousness tend to stimulate into rene-

wed activity the new subconscious traces of other precepts and idias with which they have been connected in some way in former experience and thereby to raise them into consciousness again.

যখন চৈতন্যে বর্ত্তমান কোন অনুমতি বা কল্পনাকে তাহার সহিত সম্পর্কিত অবচেতনায় সুপ্ত অন্য অনুভূতি বা কল্পনাকে মনের কাছে জাগ্রত করিয়া দেয়, তখন সেই শক্তিকে সূচনা শক্তি বলি। সূচনা শক্তি মনের বৃত্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলে।

তাই, যখন রোগজীর্ণ মনে স্বাস্থ্য ও আনন্দের ছবি উল্লেখের সহিত সেই মানসিক শক্তিকণাতেই কাজ আরম্ভ হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক যন্ত্রের উপর ভাবন্যাসের ফলে তাহারাও ক্রিয়াক্ষম হইয়া উঠে তখন মানস-চিকিৎসা হাসিয়া উড়াইয়াদিবার নহে। আমি সকলকে বলি—আপনারা বিশ্বাসী হউন, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করুন, বলুন আপনাদের পীড়া নাই। তাহা হইলে আপনারা বলবান ও তেজস্বী হইবেনই হইবেন।

আমার ছোট বয়সের কথা মনে পড়ে। আমাদের কোন পীড়া হইলে ঠাকুরমা বলিতেন, "গুরু সত্য আপদ মিথ্যা, বল নাই।" আমাদের তখন তিনবার বলিতে হইত নাই, নাই, নাই, ইহাও এই মনন চিকিৎসা।

খেলার মাঠে কেহ পড়িয়া গেলে বা ব্যথা পাইলে "নাত্ত উঠ, উঠে দৌড়ে এস আর বল নেই।" ইহার পিছনেও মনন-চিকিৎসা।

মনন-চিকিৎসাই সংস্কৃত হইয়া যোগ হইয়াছে। যোগের অপূর্ব্ব শক্তির কথা আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন এবং কেহ কেহ কিছু কিছু প্রত্যক্ষও করিয়াছেন।

আপনাদিগকে আমি সেই দুরূহ যোগশক্তির চর্চ্চা করিতে বলি না,

আমি যাহা বলিতেছি তাহা অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাহার ভিতর কোনও ফাঁকি বা বুজরুকী নাই।

শরীরকে ভাল করিবার জন্য আমরা যেমন প্রত্যহ ব্যায়াম করি, এ তেমনি মানসিক ব্যায়াম, মনের নিগূঢ় শক্তির রহস্যময় প্রভাবের উদ্বোধনের চেষ্টা। শুদ্ধ মঙ্গলময় কল্যাণপূর্ণ ভাবনার শক্তিতে নিজেকে দৃঢ়, শক্ত এবং সবল করিবার জন্য আপনারা সকলেই অবহিত হইয়া চেষ্টা করিতে পারেন।

Auto-Suggestionকে বাংলায় "ভাবপ্রক্ষেপ" বলিতে পারি। মনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা। মন বলিতেছে তুমি রুগ্ন, তুমি পীড়িত, তুমি জীর্ণ, তুমি দৈন্য ও কাতরতা প্রকাশক, তুমি দুঃখ ও বেদনায় মূহ্যমান হইয়া থাক। আমি মনকে তাহা না বলাইয়া মনের মাঝে শক্তির ও স্বাস্থ্যের ভাব-প্রক্ষেপ করিব। তাহা হইলে মনের দুর্ব্বলতা চলিয়া যাইবে, মন পুষ্ট এবং সতেজ হইবে। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মনে করুন আপনি মাথা ধরায় কষ্ট পাইতেছেন। অসহ্য যন্ত্রণা, আপনার মনে হইতেছে যে, ইহার চেয়ে মরণও ভাল। জ্বালা ও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আপনি দু'একটী ট্যাবলেট ঔষধ খাইয়া ফেলিলেন, কিংবা মাথায় অডিকোলন দিলেন, কিন্তু তাহাতে সাময়িক শান্তি হইলেও জ্বালা নিবৃত্তি হয় না।

মনন-চিকিৎসা করিতে হইলে আপনাকে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আপনি একটী সুন্দর স্থান নির্ব্বাচন করুন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যোগসাধনের স্থান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

'সমে শুচৌ শর্করা বালুকা বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষু পীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়েণ প্রযোজয়েৎ॥"

সমতল পবিত্র, ক্ষুদ্রোপল, অগ্নি এবং বালুকাবিহীন, শব্দ, জল আশ্রয় দ্বারা মনের অনুকূল চক্ষুর অপীড়াদায়ক গুহা এবং বায়ু উচ্ছ্বাস শূন্য কুটীরের নিকটবর্ত্তী স্থানে তিনি মনকে সংযোজিত করিতেন। মনন-চিকিৎসার জন্য এইরূপ সুন্দর আলোবাতাসপূর্ণ শুচিস্থান এবং শুদ্ধ আসন নির্ব্বাচন করিয়া অপ্রমত্ত হইয়া আপনি মনকে স্থির করিতে চেষ্টা করুন। তাহারপর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলুন—"আমার দৃঢ় সংকল্প আমি আর শিরোবেদনায় কষ্ট পাব না। এই বেদনা চলে যাচ্ছে। এখুনি যাবে—এই চলে গেল বলে, এই চলে যাচ্ছে। আমি ভাল হয়ে গেছি। আমি সুস্থ হয়ে গেছি।"

যতটা পারেন ততটা ঐকান্তিক আগ্রহ এবং অভিনিবেশ সহকারে বার কয়েক এইরূপ করুন, আপনার মনের সংযম শক্তি অভ্যাস হইয়া থাকিলে চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনার বেদনা সারিয়া যাইবেই।

পাঠকগণকে একথা বলা কর্ত্তব্য যে, এগুলি আমার পরীক্ষিত সত্য নহে। তবে আমি এই পদ্ধতিতে দৃঢ় বিশ্বাস করি। যাহারা বিশ্বাসবান তাঁহারা এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া দেখিতে পারেন, তাহা হইলে ইহার সত্যাসত্য নিরূপিত হইবে।

যাহা মনন করা যায় তাহাই মন্ত্র। আমি নিরোগ, আমি তেজস্বী, আমি শক্তিশালী প্রতিদিন এই আরোগ্য মন্ত্র জপ করা উচিত। জপ করিলেই সিদ্ধি হইবে। "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।" ইন্দ্রিয়সমূহের চেয়ে মন বলবান। তাহার শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া আমরা প্রতিদিন মনে করিব--"আমরা অমৃতের অংশ, আমরা চিরানন্দময়, আমরা চির তেজময়, ব্যাধি আমাদিগকে পীড়িত করিতে পারে না, দুঃখ আমাদিগকে ক্লিষ্ট করিতে পারে না, ভয় আমাদিগকে ত্রস্ত করিতে পারে না—অমরত্বলাভের

অধিকারী, বিশ্বপাতার শক্তি, সত্য ও তপস্যার শক্তি আমাদিগকে পলে পলে পোষণ ও রক্ষা করিতেছে।”

ইহাই সার্থক আরোগ্যমন্ত্র। সরল, সহজ, নির্ম্মল আরোগ্যমন্ত্র।—পথভ্রান্ত পথিকের ইহাই আলোদীপ, আশাহীন মানুষের ইহাই আলোরশ্মি।—(স্বাস্থ্য-সমাচার।)

হৃদয়-বৃন্দাবন

(শ্রীযুক্ত তারাপদ মিত্র।)

খেল্‌বে যদি গোপন খেলা এস ওহে হৃদি বৃন্দাবনে।
তোমায় নিয়ে খেল্‌ব আমি দেখ্‌বেনাক আন্‌জনে॥
হেথায় তুমি বাজিও বাঁশী গেয়ো গো তুমি মধুর গান।
আকুল হ'য়ে শুন্‌ব আমি সোহাগ ভরা বাঁশীর তান॥
ক্লান্ত তুমি হবে যখন এই আঁচলখানি দিব পেতে।
ফুলের পাখায় বাতাস দিব নিদ্রা-বিহীন গভীর রাতে॥
ক্ষুধায় যখন কাতর হবে আমি এনে দিব মিষ্ট ফল।
পিপাসাতে অই তোমার মুখে তুলে দিব শীতল জল॥
যখন তুমি আদর ক'রে ডাক্‌বে আমায় মধুর হেসে।
যেখানে থাকি অম্‌নি ছুটে তোমার পাশে দাঁড়াব এসে॥
যখন তুমি চল্‌বে পথে, পাছে—তোমার বেদন লাগে।
যতন করে পথের কাঁটা ঝেঁটিয়ে দিব তোমার আগে॥
বুকটি আমার পেতে দিব কোমল তোমার চরণতলে।
কাঁকর ভূমি কর্‌ব সরস কাতর দুটি নয়ন জলে॥

তবুও যদি বেদন লাগে, চরণ দুটি মাথায় রেখে।
সোহাগ মাখা হাত দুটি মোর বুলিয়ে দিব মনের সুখে॥
বৃন্দাবনে যা' পেয়েছিলে এখানে তুমি সকল পাবে।
আমার মনের গোপন কোণে তোমার খেলার স্থানটি হবে॥
ভাব অনুভব যত হবে—খেলার সাথী মনের মত।
তুমি বাজিয়ে বেণু মোর মন ধেনু চারিও সেথা অবিরত॥
গোঠে যাবার সময় হলে দিব প্রেম-নবনী বেঁধে আঁচলে।
আরাম কুঞ্জের ছায়ায় বসে তুমি—আমি ধন্য হব—তাই খেলে॥
এই ভালবাসা যমুনা কূলে অনুরাগ কদম্ব মূলে।
তুমি বারেক এসে দাঁড়াও হেসে আমি সকল ব্যথা যাব ভুলে॥
আমার দেহরূপ এ ব্রজপুরে—আছে প্রীতিরূপা রাধাসতী।
স্নেহ তোমার পিতা নন্দ, ভক্তি তোমার মা যশোমতী॥
খেল্‌বে রাসে রসের খেলা আমার মনোবৃত্তি সব ব্রজবালা।
তোমায় ঘিরে নাচ্‌বে তারা এ জীবন গহন ক'রে আলা॥
আছে মায়ারূপা পূতনা হেথা দম্ভরূপে বকাসুর।
অভিমান অঘ-দৈত্য কাম ক্রোধ রিপু সুপ্রচুর॥
এ সবে সংহারি, দুষ্কৃত-বিনাশ-লীলা কর লীলাময়।
বাসনা কালীয় দলি, অযুত ফণা তার কর আজি ক্ষয়॥
বৃন্দাবনেও নাহি ছিল যাহা, এখানে তুমি তাহাও পাবে।
আমার মতন অকৃতী অধম তোমার খেলার সাথীটি হবে॥

শ্রীসঙ্কীর্ত্তনের অধিবাস

(শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি ।)

বিগত ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে আশ্বিন-কার্ত্তিক যুগ্ম সংখ্যার ভক্তিতে 'বাসুঘোষ' ভণিতাযুক্ত একটি পদ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা প্রকৃতই বাসুদেব ঘোষ রচিত কি না সন্দেহ হওয়ায় শ্রীযুক্ত ভক্তি-সম্পাদক মহাশয় পাঠক-বর্গের অভিমত চাহিয়াছেন। পদটি উত্তম হইলেও উহা পার্ষদ প্রবর বাসুঘোষের কৃত পদ বলিয়া মনে না হইবার অনেকগুলি কারণ আছে।

একদা শ্রীমন্মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত একত্রে বসিয়া আছেন; অন্যান্য ভক্তবৃন্দও সমাগত; শ্রীমন্মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া সকলকেই বলিতেছেন, যদি আপনারা অনুকূল হন তবে একটি মহামহোৎসব করা যাইতে পারে। প্রভুর অভিপ্রায় জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন দিকে দিকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়া দিলেন। তখন ভক্তগণ আসিতে লাগিলেন। পত্র প্রাপ্তে—যথা প্রাগুক্ত পদে—

"চৌষট্টি মহান্ত আইল দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ॥
দেখিয়া বৈষ্ণব ঘটা প্রভুর সন্তোষ।
পদ প্রক্ষালনের জল দেন বাসুঘোষ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ব্রজলীলার প্রকার ভেদ মাত্র, মূলতঃ বিভিন্নতা বিরহিত। ব্রজের ললিতাদি অষ্ট প্রধানা সখী, নবদ্বীপ লীলায় স্বরূপ দামোদরাদি অষ্ট প্রধান মহান্তরূপে আবির্ভূত।

ব্রজলীলায় প্রত্যেক প্রধানা সখীর যেমন আটজন করিয়া সখীযূথ আছেন, নবদ্বীপ-লীলায় বৈষ্ণবরূপে তাঁহারা আটজন করিয়া (ঐ)

অষ্ট প্রধান মহান্তের পৃথগ্‌রূপে গণ্য। সুতরাং ইহঁাদের সংখ্যা (৮×৮) ৬৪ জন। বৈষ্ণব সমাজে ইহঁারাই "চৌষট্টি মহান্ত" নামে খ্যাত।

ব্রজের শ্রীদাম সুদামাদি (দ্বাদশ সংখ্যক) সখা, নবদ্বীপ লীলায় অভিরাম, সুন্দরানন্দাদি সখ্য রসাশ্রিত পার্ষদগণ (এখানেও) "দ্বাদশ গোপাল" নামে খ্যাত।

ছয় চক্রবর্ত্তীর নাম এই—১ শ্রীবাস, ২ গোকুলানন্দ, ৩ শ্যামদাস, ৪ শ্রীদাস, ৫ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ও ৬ রামচরণ চক্রবর্ত্তী।

অষ্ট কবিরাজের নাম এই—১ রামচন্দ্র, ২ গোবিন্দ, ৩ কর্ণপুর, ৪ নৃসিংহ, ৫ ভগবান ৬ বল্লভদাস, ৭ গোকুল, ও ৮ গোপীরমণ কবিরাজ।

ইহঁাদের পরিচয়। (ক) ছয় চক্রবর্ত্তী :—

১ শ্রীবাস চক্রবর্ত্তী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিত ইহঁার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ, এই তিন জনে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত সঙ্কীর্ত্তনাদি বিশেষ ভাবে প্রচারিত করেন। শ্রীবাস চক্রবর্ত্তী শ্রীমৎ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন।

২ গোকুলানন্দ ও ৪ শ্রীদাসও তঁাহারই শিষ্য ছিলেন। এই ভ্রাতৃযুগল হরিদাসাচার্য্যের পুত্র ছিলেন। যথা ভক্তি-রত্নাকরে—

"জ্যেষ্ঠ গোকুলানন্দ কনিষ্ঠ শ্রীদাস।"

*   *   *   *

"শ্রীদাস গোকুলানন্দে সবে প্রশংসয়।
দোহার আর্ত্তি যৈছে কহনে না যায়॥"

৩ শ্যামদাস। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শ্যালক ও শিষ্য; পিতার নাম গোপাল চক্রবর্ত্তী।

"শ্যামদাস রামচন্দ্র গোপাল তনয়।"

* * * *

"দোঁহে আচার্য্যের শিষ্য অদ্ভুত চরিত।" (ভঃ রঃ।)

৫ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। নামান্তর ভাবক চক্রবর্ত্তী। বাড়ী বোরাকুলি গ্রাম। ইঁহানও শ্রীনিবাস শিষ্য।

"প্রভুর কৃপা হৈল গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নাম।"
"ভাবক চক্রবর্ত্তী খ্যাতি বোরাকুলি গ্রাম।" (কর্ণানন্দ।)

৬ রামচরণ চক্রর্ত্তী। শ্রীনিবাস শিষ্য।

"শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়।
তার ছোট শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী হয়।
পরমার্থে দুই ভাই প্রভুর সেবক।" (অনুরাগবল্লী।)

(খ) অষ্ট কবিরাজ :—

১। রামচন্দ্র ও ২। গোবিন্দ কবিরাজ।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে নিত্যানন্দ শাখা বর্ণনায় এক রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজের নাম আছে, তাঁহারা উভয় নিত্যানন্দ শিষ্য। "অষ্ট কবিরাজ" পর্য্যায়ভুক্ত রামচন্দ্র ও গোবিন্দ তাঁহাদের পরবর্ত্তী ও ভিন্ন ব্যক্তি। ইহাঁরা শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শিষ্য। স্মরণ দর্পণ প্রণেতা রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর। ইহাঁরা শ্রীচৈতন্য পার্ষদ চিরঞ্জিব সেনের পুত্র, বাড়ী তেলিয়া বুধুরী।

"রামচন্দ্র কবিরাজ সর্ব্ব সদগুণ খণি।
নিজ দক্ষিণভুজ প্রভু কহিলা আপনি॥
তাঁহার কনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজ নাম।
যাঁর দ্বারে পদ প্রভু করে অনুপাম॥" অনুরাগবল্লী।)

৩। কর্ণপুর কবিরাজ। শ্রীনিবাস শিষ্য।

"কর্ণপুর কবিরাজে প্রভু দয়া কৈল।
প্রভু শাখা বর্ণনাতে যিহো ধন্য হৈল॥" (কর্ণানন্দ।)

৪। নৃসিংহ কবিরাজ।

"নারায়ণ, বাসুদেব নৃসিংহ কবিরাজ।"

* * * *

"তাহাকে আচার্য্য কৃপা কৈল অতিশয়॥" (প্রেমবিলাস।)

৫। ভগবান কবিরাজ। শ্রীনিবাসাচার্য্য শিষ্য।

"ভগবান আচার্য্য আর শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী।" (প্রেম বিঃ।)

৬। বল্লব দাস।

"শ্রীবল্লবীদাস কবিরাজ মহাশয়;
প্রভুর কৃপাপাত্র।" (অনুরাগবল্লী।)

৭। গোকুল।

"শ্রীগোকুলদাস কবিরাজ প্রেমপুর,
প্রভুর কৃপাপাত্র।" (অনু বঃ।)

৮। গোপীরমণ কবিরাজ।

"শ্রীগোপীরমণ দাস বৈদ্য মহাশয়।"

* * * *

"গোয়াসে তাহার বাড়ী বড়ই মধুর।" (কর্ণানন্দ।)

"ছয় চক্রবর্ত্তী" পর্য্যায়ের শ্রীবাস চক্রবর্ত্তীর পরিচয় কি? বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহার পিতৃ পরিচয় ও বাসগ্রামের নামাদি পাই নাই। তবে ৬ চক্রবর্ত্তী ও ৮ কবিরাজের প্রত্যেকেই শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শিষ্য বিধায়, ইনিও যে তাঁহারই শিষ্য ছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ এই চক্রবর্ত্তী ও কবিরাজগণের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। তাঁহার রচিত পদে ইহাঁদের নাম থাকা অসম্ভব বিধায় প্রাগুক্ত অধিবাসের পদটি যে তৎকৃত নহে, তাহা বলা যাইতে পারে।

প্রাচীন পদাবলী মধ্যে কোন কোন সংগ্রহ গ্রন্থে কোন কোন পদের ভণিতায় পদকর্ত্তার নাম-ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। এই নাম পরিবর্ত্তন গ্রন্থ নকল-কারকের ভুল বশতঃই হইয়া থাকে। এস্থলেও হয়তঃ তদ্রূপই হইয়া থাকিবে।

শ্রীশ্রীগৌরনিতাই সীতানাথের কোন কোন দীর্ঘজীবি পার্ষদ প্রসিদ্ধ উৎসব স্থলে বৃদ্ধকালে উপস্থিত হইয়া, পরবর্ত্তী নবীন ভক্তবর্গসহ যোগসূত্র সংস্থাপন করিয়াছিলেন; বাসুঘোষ তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন না।

ঐ উৎসবের বিরাট কীর্ত্তনে গৌরনিতাই সীতানাথ অপ্রকট ভক্তবৃন্দ সহ আবির্ভূত হইয়া (সবাকার দর্শন স্পর্শন যোগ্যরূপে) নৃত্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আত্ম-বিস্মৃতবৎ প্রকট ভক্তবর্গ তাঁহাদের একত্রে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তখন বাসুঘোষও অপ্রকট ভক্তবর্গসহ কীর্ত্তনে আবির্ভূত হন। যথা নরোত্তম বিলাস গ্রন্থে:—

"গোবিন্দ মাধব বাসু রায় রামানন্দ।
শ্রীবিজয় ধনঞ্জয় দত্ত শ্রীমুকুন্দ॥" ইত্যাদি

এই সব প্রমাণে দ্বারা বলা যায় যে, উক্ত অধিবাসের পদটী পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষের নহে।*

---

* অনেক সময় এই ভাবের প্রাচীন পদ-কর্ত্তার ভণিতাযুক্ত অনেক পদ আমরা পাই, পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া আমরা উহা যেমন পাই তেমনি ভাবেই ব্যবহার করিয়া থাকি। এইভাবে যদি বিচার করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে কোন গোলমাল থাকে না। এবিষয় সকলকেই সাধ্যমত যত্ন লওয়া প্রয়োজন। (ভঃ সঃ)

প্রভু-প্রত্যাশায়

(শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বক্সী।)

নীরব নিঝুম রাতে মিলিতে তোমার সাথে
এসেছি হে প্রাণসখা, এ নিভৃত স্থানে।
মম গূঢ়তম আশা প্রীতি প্রেম ভালবাসা
দানিতে এসেছি সখা, আজি সংগোপনে॥
তোমাহীন এ হৃদয় তীব্র বিষে বিষময়
জ্বলে মম হৃদি সদা বিরহ জ্বালায়।
দাও যদি পদধূলি চাও যদি আঁখি তুলি
সকল সন্তাপ মোর তবে ঘুচে যায়॥
তব আগমন আশে কত সুখ মনে আসে
কত সুখস্বপ্ন জাগে তোমার চিন্তায়।
জান কিগো প্রিয়তম এ ক্ষুদ্র হৃদয় মম
কেমন আকুল নেত্রে তব পানে চায়॥
জান যদি এস ত্বরা কর দয়া দাও ধরা
বাহু প্রসারিয়া আর কতকাল রব।
অবশ শিথিলকায় বুঝিবা পরাণ যায়
তোমার বিরহ ব্যথা কতকাল সব॥
এস এস প্রিয়তম প্রাণাধিক প্রাণোপম
এস নিরঞ্জন এস কঠিন কোমল।

এস এস প্রাণারাম এস শান্তি সুখধাম
এসগো নির্ম্মল চির-স্নিগ্ধ সুশীতল ॥
এ বিশ্ব তিমিরে থাক্ অথবা অতলে যাক
নরক অথবা হোক স্বর্গের সমান।
কি কাজ জানিয়া তাহা কর অভিলাষ যাহা
এস হৃদে লভি তোমা জুড়াই পরাণ ॥

সেবাধর্ম্ম

(প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর গোস্বামী পুরাণরত্ন।)

"সেবাহি শ্রেষ্ঠো ধর্ম্মঃ"। এই কলিযুগে সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই সেবা শব্দের অর্থ নানাপ্রকার হইতে পারে। আমি এই প্রবন্ধে সেবাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছি। এই দুই প্রকার সেবার নাম যথাক্রমে দেবসেবা ও জীবসেবা। শ্রীবিগ্রহের পূজা, বন্দনা, অঙ্গরাগ ও প্রণিপাত ইত্যাদিকে দেবসেবা কহে। দীন দরিদ্রের সেবা ও সর্ব্বভূতে দয়া প্রদর্শন করাকে জীবসেবা কহে। দেবসেবা শ্রীভগবানেরই সেবা। সে সেবা মূর্ত্তি ভিন্ন সম্ভব নহে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে মানসিক পূজার ও সেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহা আমাদিগের ন্যায় সাধারণ মনুষ্যের জন্য নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াও শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মারা শ্রীবৃন্দাবন ধামে থাকিয়াও অহরহঃ শ্রীবিগ্রহ সেবায়

বিভোর থাকিতেন। শ্রীবিগ্রহসেবা সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রীতি ও অনুরাগের বিষয় শ্রবণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সাধনমার্গের অতি উচ্চ স্থানে থাকিয়াও তাঁহারা যুগল মূর্ত্তির পূজাদি সমস্তই করিতেন। সুতরাং নিম্নশ্রেণীর সাধক মাত্রেই মূর্ত্তি পূজা ব্যতীত যে সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেবসেবায় ভক্তির উদয় হয়, অহঙ্কার দূরে যায় ও চিত্ত-দর্পণ পরিমার্জ্জিত হইয়া মানসিক তৃপ্তিলাভ হয়। এই দেবসেবার প্রভাবে যাহা অতি দূরে, যে বস্তু চতুর্ব্বর্গের অতীত তাহা ক্রমশঃ অতি নিকটে, যাহা অন্তরাভ্যন্তরে তাহা বাহিরে এবং যাহা হৃদয়াধিষ্ঠিত তাহা চর্ম্মচক্ষের সম্মুখে নিরন্তর ভাসিতে থাকে। জীবসেবায় বিপন্নকে রক্ষা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, শরণাগতকে অভয় প্রদান, যাচকে অর্থ বিতরণ করিতে হয়। প্রেমময় শ্রীগোবিন্দের নিকট জীবই প্রিয়। জীবসেবা করিতে করিতে দেবসেবারও ফললাভ হইয়া থাকে। জীবহিংসা করিয়া কখনও কোন কালে কেহ শ্রীভগবানকে লাভ করিতে পারে না। যখন জীব হিংসায় দেশ উৎসন্নের মুখে চলিতেছিল ঠিক সেই সময়ে শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেব রূপে অবতীর্ণ হইয়া "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই মহামন্ত্রে অসংখ্য শিষ্যকে দীক্ষিত করতঃ অধর্ম্মের শ্রোত ফিরাইয়া ধর্ম্মের পবিত্র মন্দাকিনীর প্রবাহ ছুটাইয়াছিলেন। ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিংসার বিভৎসভাব দূর করিবার জন্য শ্রীভগবান মহাত্মা মহম্মদকে পাঠাইয়াছিলেন। তবে যেমন সকল মনুষ্য Evolution এর এক শ্রেণী ভুক্ত নহে, যেমন প্রবৃত্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক দেখা যায়। সেইরূপ শ্রীভগবানের কার্য্যেও তারতম্য লক্ষিত হয়। কিন্তু মোটের উপর উদ্দেশ্য সমানভাবে বর্ত্তমান থাকে। এই তত্ত্বটি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত ব্যাপারটি অনেকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখিয়

থাকেন এবং তাহাতেই মতভেদ লক্ষিত হয়। নতুবা যাহা সত্য তাহা চিরদিনই সত্য ও সকল ধর্ম্ম সমভাবে অবস্থিত। জীবরক্ষা ভগবানের ইচ্ছা, জীবের উদ্ধার তাঁহার অভিপ্রায়। এইজন্যই তিনি এই পৃথিবীতে লীলাদেহ গ্রহণ করেন। তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য মানবেরা সাধন করুক, ইহা তাঁহার একান্ত অভিলাষ। এই অভিপ্রেত কার্য্য মানব কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন না হইবার সম্ভাবনা বুঝিলে শ্রীভগবান্ অবতাররূপে মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে ৭ম ও ৮ম শ্লোকে ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন এই যে,—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

জীবমাত্রেই পরমেশ্বরের সন্তান এই বোধে জীবসেবাই শিবসেবা। জীবসেবা অবহেলা করিলে শিবসেবা নিষ্ফল। যেহেতু জীবকে আপনার জ্ঞান যাহার না হইয়াছে, তিনি শ্রীভগবানকে কিছুই বুঝেন নাই, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই যে সমস্ত ভগবানের প্রকৃত ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের সকলের জীবনেই এই সত্য উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত। সর্ব্বজীবে যাঁহার সমতা বোধ আছে তিনিই ত ভগবদ্ভক্ত। ভক্ত নীলকণ্ঠ গাহিয়াছেন—

"কবে হবে আমার সে প্রেম সঞ্চার।
(যবে) বল্‌তে হরিনাম, শুন্‌তে গুণগ্রাম,
অবিরাম নেত্রে বহিবে অশ্রুধার ॥" ইত্যাদি

ইস্‌লাম ধর্ম্মেও মহাত্মা সেক্‌সাদী, ফরদোসী প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তের জীবনে ঐ একই সত্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে ভগবদ্ভক্তের সর্ব্বজীবে

মমতা বোধ জন্মিয়াছে, তিনি সমুদয় জগৎখানাকে নিজের বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছেন। তিনি নিরন্তর কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন, তাহা তিনি ব্যতীত অপরে বুঝিতে পারে না। কিন্তু ঐ আনন্দের গোড়া জীবসেবা। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ "নামে রুচি জীবে দয়া" ইত্যাদি। একদিন আসমুদ্র হিমাচল সর্ব্বত্র সকল হিন্দু পরিবারে সেবাধর্ম্ম পালনের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। তন্মধ্যে অতিথি সৎকার একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। কিন্তু হায়! কালের এমনই প্রভাব এবং কলির এতই প্রতাপ যে, হিন্দু-গৃহস্থের হৃদয় হইতে সেবাধর্ম্মের ভাব ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। সবই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকথা *

(শ্রীযুক্ত ভীমাচরণ চৌধুরী কর্ত্তৃক সংগৃহীত।)

——:•:——

সখিহে! শুন মোর হত বিধি বল।
মোর বপু চিত্ত মন সকল ইন্দ্রিয়গণ
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল॥

পরমকৃপালু পূজ্যপাদ শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত পয়ার উল্লেখ করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রেমো-

---

* হাওড়ার শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীতে প্রভুপাদ শ্রীযুক্তপ্রাণকিশোর গোস্বামী বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহোদয়ের বক্তৃতার সারাবলম্বনে লিখিত।

ন্নাদ দশার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছেন। নীলাচল ধামে গম্ভীরার অভ্যন্তরে স্বরূপ দামোদরের কণ্ঠধারণ করিয়া আকুল উৎকণ্ঠায় বিষাদিত গৌরহরি নিজ হৃদয়ের দুঃখের কপাট উদ্ঘাটন করিতেছেন। মাদনাক্ষ্য মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধাঠাকুরাণীর ভাবে বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দররূপে নিকুঞ্জ কাননে লীলা-সহচরী যাঁহারা স্বরূপ-দামোদর-রামানন্দ রায় রূপে গম্ভীরার লীলা বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাদেরই সহিত সেই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ রসাস্বাদনে নিমগ্ন রহিয়াছেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আকুল উৎকণ্ঠায় বলিলেন,—'ওহে স্বরূপ,ওগো রামানন্দ, বল—বল, কেমন করিয়া এই দেহভার বহন করি ? শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ যদি না আমার এই ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিসেবিত হইল, বল—বল তবে এই ইন্দ্রিয় ভার বহন কবিবার স্বার্থকতা কি ? রসহীন পাষাণ, শুষ্ক ইন্ধন ভারের ন্যায় দেহ ধারণ বৃথা বলিয়াই আমার জ্ঞান হইতেছে। ইন্দ্রিয়গণের সাফল্য কোথায় ?ঃ সকল ইন্দ্রিয়ের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট শ্রীগোবিন্দের স্বরূপানন্দ ভোগকরাই যে ইন্দ্রিয়গণের উপজীবিকা। বহির্জগতের রূপ-রসাদি ভোগ. করিয়া ইন্দ্রিয়গণ প্রতিদিনই যে ক্ষীণতর হইয়া যায় উহাদের ক্ষুধা মিটেও না, আকাঙ্খা বাড়িয়াই যায়, পরিশেষে উহারা একেবারেই বিকল হইয়া পড়ে। বস্তু জগৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় অনু পরমানুর অন্তরেও সেই পরমানন্দ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে এমন কি বিশেষত্ব আছে যাহাতে নিখিল জীব-জগৎ তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। সাধারণতঃ আমরা জগতে এই সাধারণ রীতি দেখিয়া থাকি যে, সমান গুণের বস্তু পরস্পর—পরস্পরকে আকৃষ্ট করে, যেমন চুম্বক লোহাকে টানিয়া নিজের বুকের কাছে লইয়া আসে কিন্তু মাটির ঢেলাকে টানে না। আরো দেখাযায়, কোন একটী বিশেষ বস্তুর প্রতি অন্য দুইটি বস্তু পৃথক ভাবে আকৃষ্ট হইলে,

তাহাদের পরস্পর সম আকর্ষণের বশীভূতত্ব হেতু পরস্পর আকৃষ্ট হয় এই আকর্ষণমূলে পরম আনন্দ। এই আনন্দ অনুভবের বস্তু, পরমানন্দের আকর্ষণ কেহ মুখে বলিয়া বুঝাইতে পারে না ইহাকে শাস্ত্রে স্বয়ংবেদ্য রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হৃদয়ে হৃদয়ে নিজে অনুভব করা যায় তাহাকেই বুঝাইবার জন্য স্বয়ংবেদ্য কথার ব্যবহার। যে কথা কহিতে পারে না তাহাকে কোন সুমিষ্ট পদার্থ আস্বাদন করাইয়া যদি জিজ্ঞাসা করা যায় কেমন লাগিল, সে যেমন বলিবার শক্তি নাই বলিয়া মুখের ভঙ্গিকরিয়া মাধুর্য্য বুঝাইবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে. অথচ সম্যক রূপে মাধুর্য্যের আস্বাদন বুঝাইতে সমর্থ হয় না তেমনি শ্রীভগবৎ স্বরূপানন্দকোন ভাষার দ্বারা অথবা ভঙ্গি করিয়া বুঝান যায় না। ইন্দ্রিয়গুলি জড় উপাদানে গঠিত, কাযেই উহারা অতীন্দ্রিয় স্বরূপানন্দ প্রকাশ করিতে অসমর্থ। ভাষার গতি অনেক দূর যায় কিন্তু সেই পরমানন্দকে প্রকাশ করিতে যাইয়া সে ফিরিয়া আসে, মনের গতি ভাষা হইতে আরো প্রসারিত। তথাপি মনও আনন্দরাজ্যের সীমা হইতে ভাষার সহিত ফিরিয়া আইসে। এই কথাই উপনিষদে বলা হইয়াছে, "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" এই আনন্দের পরিজ্ঞানে জীবের জনম মরণের ভয় যেটা সবার চাইতে বড় ভয় সেটাও চিরকালের জন্য দূর হইয়া যায়।

ভাষার গতি কত দূর বিস্তৃত তাহা কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। চারিদিকে যে অনন্ত শব্দ ঝঙ্কার গগন পবন তোলপাড় করিয়া দিতেছে সেই শব্দ ঝঙ্কার গ্রহণ করিবার যোগ্যতা সম্পন্ন ইন্দ্রিয় না থাকিলে সকলি ব্যর্থ। কালার কানে জগৎ শব্দ হীন। বিষয়ও চাই, বিষয় গ্রহণের ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বও চাই। সেই শব্দের মূল কোথায়? বৈজ্ঞানিক বলিবেন আকাশে, আকাশকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তুমি কি শব্দের মূল? আকাশ বলিবে আমি শব্দের মূল এই কথা সত্য বটে, কিন্তু বাতাস

যখন আমার সঙ্গে এসে জুটল তখন ঐ সম্ভাবনা রূপে স্থিত ধ্বনির বিকাশ হইল, এইত আকাশ সর্ব্বব্যাপী, এমন দেশ নাই যেখানে আকাশ নাই এই বিভু আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়া বলা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে শব্দকেও ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আকাশকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কিছুই পাই না। এক মহাশূন্য একটা বিরাট সত্ত্বা মাত্র উপলব্ধির বিষয় হয়। এই মহাশূন্যের বিরাট সত্ত্বাকে বুঝাইবার জন্য মহাজ্ঞান, পরব্রহ্ম আনন্দ বা সচ্চিদানন্দ গোবিন্দ বলিয়া শ্রুতি স্মৃতি পুরানের নির্দ্দেশ। সেই আনন্দের কণিকা প্রতি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট, প্রতি পদার্থে তাহারই বিকাশ। এইরূপে বিশ্বপ্রবিষ্ট হইয়াও তিনি অপ্রবিষ্ট, বিকার রহিত। একখণ্ড বস্ত্রে সূত্রভিন্ন আর কিছুই নাই, টানা ও পোড়েন উভয়ই সূত্র, অথচ কতকগুলি সূত্রদ্বারা বস্ত্রের ব্যবহার কিন্তু বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা সূত্রের কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। এইপ্রকার ব্যবহার করিতে গেলে লোকে বাতুল বলিয়া উপেক্ষা করিবে। সূত্রের একটা বিশেষ সম্মিলনে এই বস্ত্রখণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে! অথচ যেমন বস্ত্র সূত্রময়, তেমনি শ্রীভগবান বিশ্বের অন্তরে অনুপরমানু রূপে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলেও জগতের কোন বস্তুকে ধরিয়া ভগবৎ স্বরূপকে দেখিয়াছি, পাইয়াছি বলিলে লোকে বাতুল বলিবে। আবার ভগবানের কাছেও বিষয় জগতের সুখ সৌভাগ্য প্রার্থনা করিলে লোকে বাতুল বলিবে। শাস্ত্র বলিতেছেন— সংসার যেমনটি আছে তেমনটি ভাবে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিও না উহার বুক চিরিয়া অন্তরে যে অনন্ত আনন্দ প্রস্রবন বহিয়া যাইতেছে উহাকে লইয়া সুখী হও। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কোন বস্তুকে বুক ছাড়া করিতে চায় না কোন বস্তুকে উপরের দিকে ছুড়িয়া ফেলিলে পৃথিবী তাহাকে বুকের দিকে টানিয়া লয়। হাউইবাজী জোর করিয়া উপরে উঠিয়াও অধোমুখে পড়িয়া যায় এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত মায়িক জগতেরও

আকর্ষণের একটা গণ্ডি আছে। সেই আকর্ষণের সীমানায় গিয়া দাঁড়াইলে চিৎরাজ্যের আকর্ষণ উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা আইসে।

বৈজ্ঞানিকগণ চন্দ্রলোকে সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে একটা যন্ত্রের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, উহাতে হাউই বাজির মতন কয়েকটি যন্ত্র থাকিবে এবং সে গুলি পর পর জ্বলিয়া উঠিয়া মূল যন্ত্রটিকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিবে। অবশেষে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাহিরে নিয়া যন্ত্রটিকে চন্দ্রের আকর্ষণে ফেলিয়া দিবে, ফল হইবে চন্দ্র যন্ত্রটিকে নিজের শক্তিতে নিজের বুকে টানিয়া লইবে। প্রাচীন ঋষিগণও সাধনরাজ্যের ব্যাপার এই রূপেই অনুভব করিয়া ছিলেন। আমাদিগের জ্ঞান যোগ তপস্যা কল্পিত যন্ত্রটির হাউইয়ের মত পর পর শক্তি সঞ্চার করিয়া সাধককে মায়া আকর্ষণের সীমানায় লইয়া গিয়া ভগবৎ আকর্ষণে ফেলিয়া দিবার সাধনা মাত্র। ইহার পর সাধককে ভগবান নিজের কৃপা শক্তি বলে বুকের কাছে টানিয়া লন এইটি তাঁহার স্বভাব। আমাদের ইন্দ্রিয় কাদা মাটি মাখা তাই গোবিন্দ চুম্বকের আকর্ষণে পড়ে না। মায়িক জগতের বন্ধনে আবদ্ধ তাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আকর্ষণ করেন না। তবে তিনি নিরন্তরই নানাভাবে নানাবেশে সাধকের অন্তরে উঁকি দিয়া সুযোগ খুঁজিতেছেন কখন তাহাকে টানিয়া লইবেন। প্রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে শ্রীগোবিন্দের নাম রূপ রস গন্ধ উপস্থিত করিয়া ইন্দ্রিয়ের জড়তা দুর করিয়া দিতে পারিলেই সেই গোবিন্দ স্বরূপানন্দ অস্বাদন করিয়া জীব কৃত কৃতার্থ হইতে পারে। সেই অনন্ত স্বরূপ গোবিন্দের অনন্ত নাম, অনন্ত রূপ, অনন্ত রস, অনন্ত গন্ধ স্বয়ং অনন্তদেব অনন্ত মুখে-চোখে আস্বাদন করিয়া জগৎকে পালন করিবার জন্যই অনন্ত প্রেমপাগল শ্রীনিতাইচাঁদরূপে জীবের দ্বারে দ্বারে শ্রীগোবিন্দের অনন্ত মাধুরী আস্বাদন বাড়াইবার জন্য হরিবোল হরিবোল বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আসুন আমরাও তাঁহার সহি

সহস্রকণ্ঠে সম্মিলিত হইয়া হরিবোল ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করিয়া তুলি।—হরিবোল, হরিবোল।

মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্‌

(শ্রীযুৎ রামদয়াল মজুমদার এম, এ লিখিত।)

("উৎসব" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।)

পরমাদরবতী শ্রুতি, সচ্চিদানন্দ—প্রপঞ্চোপশম—শান্ত—শিব—অদ্বৈত যিনি তাঁহাকেই বলিতেছেন "মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" উত্তোলিত বজ্রহস্তে অতি ভয়ঙ্কর। যেমন ভৃত্যবর্গ স্বামীকে বজ্রহস্তে সম্মুখে আসিতে দেখিলে ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার শাসন মত চলে, তাঁহার নিয়মের বিপরীতে চলিতে সাহস পায়না, সেইরূপ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অলঙ্ঘ্য নিয়ম যাঁহারা জানিয়াছেন তাঁহারাই পরমেশ্বরের ভয়ে ভীত হইয়া পরমেশ্বরের নিয়মমতই চলেন—সে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে কিছুতেই পারেন না। যাহারা মূঢ়বুদ্ধি, যাহারা মূর্খ তাহারাই পরমেশ্বরের নিয়মকে আপনার সুবিধা মত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া—আর সময়ের উপযোগী করিয়া লইতেছি বলিয়া—নিজের স্বকপোল কল্পিত কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা করে। বলিতে'ছ এইরূপ প্রকৃতির মানুষই মূর্খ—মূঢ়বুদ্ধি। পরমেশ্বরের নিয়মকে সময়োপযোগী করিতে যাওয়াই মূর্খতা—কিন্তু সময়কে পরমেশ্বরের নিয়মে ফিরাইতে চেষ্টা করাই পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করা। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি এবং খেচর, স্থাবর, জঙ্গমাদি যাবতীয় পদার্থ

যে যে পৃথক নিয়মে চলিতেছে—স্বয়ং তিনিই যে নিয়মের প্রবর্ত্তক, তাহার পরিবর্ত্তন কে করিতে পারে ?

বলিতেছি যাঁহারা এ নিয়ম জানিয়াছেন তাঁহারাই সেই উদ্যত বজ্র মহাভয়ঙ্কর প্রভুর ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সাহসী হন না! যে প্রবল শক্তি পাইয়াছে সে যদি মূর্খ হয় তবে সে আপন শক্তির অসৎ ব্যবহার করিবেই। কেননা সে মূর্খ—কিন্তু যাঁহারা তাঁহার এবং তাঁহার নিয়মের সন্ধান পাইয়াছেন তাঁহারা তাঁহাকে উদ্যত বজ্র মহাভয়ঙ্কর জানিয়াই কখন সীমা অতিক্রম করেন না। জানিয়াছেন কাঁহারা ? শ্রুতি বলিতেছেন—

ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

জানিয়াছেন বলিয়াই পরমেশ্বরের ভয়ে ভীত হইয়া অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাপ প্রদান করেন, সূর্য্যের দেবতাও তাপ প্রদান করেন। তাঁহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং পঞ্চম মৃত্যু—স্বয়ং যমরাজ কার্য্য করেন। অগ্নি, সূর্য্য, লোকপালগণ অসীম শক্তিশালী—আপন ইচ্ছামত চলিলে ইহাঁরা আপন আপন শক্তির অপব্যবহার করিয়া জগৎকে দগ্ধ করিতে পারিতেন কিন্তু সেই উদ্যতবজ্র মহাভয়ঙ্কর পুরুষকে জানেন বলিয়াই ইঁহারা ইঁহার ভয়ে ভীত হইয়া—ইঁহার ভৃত্য হইয়া প্রভুর আজ্ঞামত চলিতেই ভালবাসেন।

আজকালকার ভারতের দিকে চাহিয়া দেখ—শুধু ভারতে কেন—বিশ্বের দিকে চাহিয়া দেখ পরমেশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করিতেছে কয় জন—পরমেশ্বরের নিয়মই বা জানিতে চায় কয় জন ? এই উদ্যত বজ্র মহাভয়ঙ্কর ঈশ্বরকে ভয় করে কয় জন ? শুধু পড়িয়াই বিরত হইলে হইবে না—একবার স্থির চিত্তে ভাবনা কর, তুমি কি ঈশ্বর কে ভয় কর ?

ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন করিতে ভয় কর? যদি বল আমরা ঈশ্বর মানি না—ঈশ্বরের নিয়মও মানি না, তবে বলিতে কি পারা যায় না তোমার মত হস্তি মূর্খ আর কে? পশুও ত ঈশ্বর জানে না—ঈশ্বরের নিয়মও জানে না—তুমি কি তাই হইয়া গিয়াছে? কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মে জগৎ চলিতেছে তাহা যদি জানিতে চেষ্টা করিতে তবে তোমার পাপ কার্য্য প্রচারের চেষ্টা হইতে তুমি নিশ্চয়ই বিরত হইতে।

এই যে ভল্লুকটী লইয়া ঐ মানুষটী নাচাইতেছে—ভল্লুক উহাকে আলিঙ্গন করিতেছে—আর ঐ ব্যক্তি ভল্লুক দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে—এই কর্ম্মের মূলে কি আছে কখন চিন্তা করিয়াছ কি? বিনা কারণে কার্য্য হয় না। যদি বলা যায় ভল্লুক পূর্ব্বজন্মে মানুষ ছিল—ভল্লুক-নর্ত্তকের নিকটে—এ ব্যক্তি ঋণী ছিল—আপন কর্ম্ম দোষে অর্থাৎ উদ্যত বজ্র মহাভয়ঙ্কর প্রভুর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ছিল বলিয়া মানুষটা ভল্লুক জন্ম পাইল। থাকিত বনে—স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিত—কিন্তু পূর্ব্বকৃত ঋণ শোধ করিবার জন্য সেই প্রভুর নিয়মেই ভল্লুক-নর্ত্তকের অধীনে আসিয়া উহার ঋণ শোধের জন্য ভল্লুক উহার হস্তে কত প্রহার খাইতেছে আর লোকের কৌতুক উৎপাদন করিয়া ঋণ শোধের কার্য্য করিতেছে।

ঐ যে কুকুরটী তোমার শয্যায় স্থান পাইতেছে—আর তুমি কত মতে সেবা করিতেছ ঐ কুকুর তোমার কে, যদি ভাবিতে পারিতে, তবে বুঝিতে তুমি কুকুরের নিকট ঋণী—হয়ত কুকুরটী তোমার নিতান্ত আত্মজন। আপন কর্ম্মফলে সেই উদ্যতবজ্র মহাভয়ঙ্কর পরমেশ্বর উহাকে কুকুরজন্মে নামাইয়া দিয়াছেন—আর তুমি উহার ঋণ পরিশোধের জন্য উহার সেবা এই জন্মে করিতেছ।

ঈশ্বরের ভয় যদি করিতে, যদি শাস্ত্রবাক্যে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিতে

তবে কি ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইতে ? তবে কি "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসিত", "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ"—ঈশ্বরের এই সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক বর্জ্জন করিয়া শূকর কুক্কুটাদি ভক্ষণ করিয়া মস্তকটী বিকৃত করিয়া ঈশ্বরের নিয়মের বিপরীতে সমাজকে কুশিক্ষা দিবার জন্য পুস্তকে লিখিতে, সতীত্ব নারীত্বের সঙ্কোচক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং" যিনি বলিয়াছেন তাঁহার কথা না মানিয়া উহার বিপরীত আচরণ করিতে তুমি পারিতে—তবে কি পরমেশ্বর সৎগুরু হইলেও জ্ঞানবান্ আচার্য্যকে গুরুপদে বরণ করিতে চাহিতে না—আর অধিকারী বিচার না করিয়া সকলের জন্য একরূপ উপাসনা চালাইতে চেষ্টা করিতে ? কয়টি আর বলা যাইবে ?

আমাদের বুদ্ধি যদি এইরূপ কলুষিত হইয়া যায়—আমরা যদি ঈশ্বরকে ভয় করি কি না ইহার বিচার না করি, তবে জানিয়া হউক বা না জানিয়াই হউক পরমেশ্বরের নিয়ম অতিক্রম করি বলিয়া আমাদের মস্তকে কি তাঁহার বজ্র পতিত হইবে না ? আজ পর্য্যন্ত পড়ে নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কি হইবে—আপনার ভুল ধারণা যদি না ছাড়ি তবে কালে নিশ্চয়ই পড়িবে।

ভগবান শুধু প্রেমময় নহেন—তিনি হস্তে বজ্রও ধারণ করেন। দেখনা আজ গুরুবিরোধী জনগণের উপরে বজ্র পড়িতেছে কি না ? এতরোগ ইহাদের কেন ? এত মনঃপীড়া ইহাদের কেন ? ক্রমে যত দিন যাইবে ততই ইহাদের যাতনা বৃদ্ধি পাইবেই—মস্তকে বজ্র পড়িলে কি যাতনা শূন্য হইয়া থাকা যায়—না ছট্‌ফট্ করার বিরতি হয় ?

তোমাদের কুশিক্ষা প্রচারে সমাজ আজ কোন্‌পথে চলিতেছে? তোমরা বল জাতিটা উন্নত হইতেছে—উন্নতির এই কি লক্ষণ ? অশান্তি দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে, তবু বলিবে জাতিটা সজীব হইতেছে—বহু

লোকে প্রলাপ বকিতেছে আর তুমি বলিতেছ সমাজ সজীব হইতেছে? মানুষের সুখের কোন্ চিহ্ন পাইতেছ? যদি মনে মনে ভাবিয়া থাক পুরাতন সমাজ ভাঙ্গিয়া নূতন সমাজ গড়িবে—কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম ধরিয়া যে সমাজ গড়া হইয়াছিল সেই পথে না চলিতে পারিলে সমাজের বহুকাল সঞ্চিত জড়তা—বহুকালার্জ্জিত কপটতা-জন্য কুসংস্কার, ইহা কখনও দূর করিতে পারিবে না।

পরমেশ্বর কোন্ বস্তু—পরমেশ্বরের নিয়ম কোন্‌গুলি ইহা নিজে বুঝিয়া, সেইমত নিজে আচরণ করিয়া—সমাজের দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ কর তবেই "মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" ইহার ভয় সমাজে আনিতে পারিবে। ভয় ও ভালবাসা উভয়ই যে তাহাতে চির বিরাজিত সমাজকে ইহা শিক্ষা দাও তবে জাতিটা—তাই কেন—কলির জগৎটা সাধুপথে চলিবে।

প্রবন্ধ বিষয়ে আরও দুই একটী বলিবার বিষয় আছে।—

১। আমরা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস সর্ব্বত্রই অবতারের কথা পাই। আবার বিচারেও দেখি "ভক্তচিন্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ" গীতার মত শাস্ত্রও অবতার সমর্থন করে। আমরা দেখি হিন্দু দেব দেবী হস্তে কোন না কোন অস্ত্র ধারণ করেন। মহাদেবের হস্তে ত্রিশূল, দুর্গার দশহস্তে দশ প্রহরণ, কালীর হস্তে খড়্গ, রামের হস্তে ধনুর্ব্বাণ, কৃষ্ণের চক্র—এই সমস্তই "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং ইহাই দেখাইতেছে।

২।—যাহারা ভগবানের নিয়ম পালন করে না তাহাদের দণ্ডের কথা সর্ব্বশাস্ত্রের সার গীতাও বিশেষ ভাবে বলিতেছেন। যাহারা ভগবানকে মানে না—ভগবানের আজ্ঞা পালন করে না তাহাদিগকে এই "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" পরমেশ্বর বলিতেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ গীতা—১৬।১৯

আমার বিদ্বেষী, ক্রূরকর্ম্মা সংসারে নরাধম পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে আমি অশুভ আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥

গীতা—১৬।২০

আসুরী যোনি এবং অতিক্রূর ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া এই সমস্ত মূঢ়, জন্মে জন্মে আমাকে না পাইয়া তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট কৃমি কীটাদি গতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞান বিমূঢ়াং স্তান্ বিদ্ধিনষ্টানচেতসঃ ॥

গীত—৩।৩২

জগতের অনুশাসিতা আমি (কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্। ৮।৯) যে নিয়মে জগচ্চক্র চালাইতেছি—অসূয়া পরবশ হইয়া যাহারা আমার এই ব্যবস্থার অনুষ্ঠান করে না সেই নষ্টবুদ্ধি মানুষ সকলকে সর্ব্ববিধ জ্ঞানে বিমূঢ় ও নষ্ট বলিয়াই জানিবে।

ঈশ্বরকে ভয় করিতে কি শিখিবে? সংসারে যা'কিছু জ্বালা পাইতেছ তাহা কিন্তু উদ্যোলিত বজ্র ভয়ঙ্কর সেই প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘনের দণ্ড। এখনও সতর্ক হও, সম্প্রদায় রক্ষার জন্য ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া সব নষ্ট করিওনা। আন্তরিকতা যদি থাকে প্রথমে ভয়ে, পরে ভক্তিতে ভগবান ভজ।

—০—

প্রশ্নোত্তর

জনৈক "ভক্তি" পত্রিকার গ্রাহক সুদূর ব্রহ্মদেশ হইতে লিখিয়াছেন—"বৈষ্ণবের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন।" যদিও এবিষয়ে বলিবার অনেক আছে তথাপি আমরা মোটামুটি শাস্ত্রে যে কয়টী গুণের উল্লেখ পাই তাহাই লিখিলাম। যদি কোন পাঠক এবিষয় বিস্তৃত বিবরণ কিছু লিখিয়া পাঠান তবে আমরা যথাকালে উহা "ভক্তি"তে প্রকাশ করিব। শাস্ত্রে ২৬টী গুণের উল্লেখ পাই, যথা :—

১। কৃপালু (করুণাযুক্ত)। ২। অকৃতদ্রোহ (অনিষ্টাচরণরহিত)। ৩। সত্যসার (সত্যনিষ্ঠ)। ৪। সম (পক্ষপাত শূন্য)। ৫। নির্দ্দোষ (ষড়দোষবিবর্জ্জিত)। ৬। বদান্য (দানশীল)। ৭। মৃদু (কোমলস্বভাব)। ৮। শুচি (নির্ম্মলাত্মা। ৯। অকিঞ্চণ (বিষয়াভিমানরহিত)। ১০। সর্ব্বোপকারক (সকলের আনুকূল্যকারক)। ১১। শান্ত (শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠবুদ্ধি)। ১২। অকাম (ফলাভিসন্ধিরহিত)। ১৩। শ্রীকৃষ্ণৈকশরণ (অনন্তভাবে শ্রীকৃষ্ণপদাশ্রয়)। ১৪। নিরীহ (নিস্পৃহ)। ১৫। স্থির (দৃঢ়)। ১৬। বিজিত ষড়গুণ (জিতেন্দ্রিয়)। ১৭। মিতভুক্ (পরিমিতাহারী)। ১৮। অপ্রমত্ত (অত্যাশক্তিশূন্য, সাবধান)। ১৯। মানদ (সম্মান প্রদান কারী)। ২০। অমানি (অভিমানশূন্য)। ২১। গম্ভীর (নির্ব্বিকার)। ২২। করুণ (দয়ার্দ্রচিত্ত)। ২৩। মৈত্রী (মিত্রতা)। ২৪। কবি (ভাগবতরসজ্ঞ)। ২৫। দক্ষ (ভজনশীল)। ২৬। মৌনী (বৃথাবাক্যব্যয়না করা)। এসম্বন্ধে বলিবার অনেক রহিল। কেবলমাত্র ৬টী গুণেরই উল্লেখ করিলাম।

বৈষ্ণব-দাসানুদাস—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র অধিকারী।

থাকি কতক্ষণ প্রিয়ার সহিত
কি জানি কি ভাব উদিল,
কি যেন শুনিয়া উৎকর্ণ হইয়া
"আসি আসি" বলি ধাইল।
হেথা শ্রীবাসের গৃহে সুমঙ্গল
উঠিছে কীর্ত্তন ধ্বনি ;
উৎকণ্ঠিত সবে গৌরাঙ্গ বিহনে
সবারই হৃদয়ে গ্লানি।
সুনীলিম নভেঃ শোভে তারা রাজি,
শশধর হাসি বিহনে,
কিবা অবসাদে আবরে অম্বরে,
অনুৎসাহ বহে পবনে।
মধ্যমণি-হীন্ চারু রত্নহারে
না ফুটে যেমন সুষমা,
গৌরাঙ্গ বিহনে শ্রীবাস অঙ্গনে
কীর্ত্তনে না জাগে গরিমা !
"এস প্রাণনাথ ! " ডাকে গদাধর ;
শ্রীবাস কাতরে কয়
"আজি কেন হেন বিলম্ব করিছ,
এস এস দয়াময় !"
বহিল সমীর সুবাসমণ্ডিত,
হাসিল আকাশে শশী,
ধীরে ধীরে গোরা করি আগমন
নাচিল কীর্ত্তনে পশি !

সবাকার চিত প্রফুল্ল প্রসন্ন,
অসীম উৎসাহ ভরে
সুখ শান্তিময় অমিয় সাগরে
সবে সন্তরণ করে।

পদকল্পতরু ধৃত মহাজনী পদে ঃ—

"নাচে শচীনন্দন ভকত জীবন ধন
সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় নিত্যানন্দ।
অদ্বৈত শ্রীনিবাস আর নাচে হরিদাস
বাসুঘোষ বসু রামানন্দ ॥
নিত্যানন্দ মুখ হেরি বলে প্রভু হরি হরি
প্রেমায় ধরণী গড়ি যায়।
প্রিয় গদাধর আসি প্রভু বাম পাশে বসি
ঘন নরহরি মুখ চায় ॥
প্রভু নাহি মেলে আঁখি কহে "মোর কাঁহাসখী
কাঁহা পাব রাই দরশন।
কত কহ নরহরি আর সম্বরিতে নারি"
ইহা বলি হ'ল অচেতন ॥
"এখনি আছিনু সেথা কে মোরে আনিল হেথা,
রাস রসে নিকুঞ্জ ভবন।"
গেল সুখ-সম্পদ এবে ভেল বিপদ
বিষাদয়ে এ দাস লোচন ॥"

গৌরাঙ্গ বিষাদ ভরে "রাধে রাধে" বলিয়ে
কাঁদি বিচেতন হ'ল যবে,

কি যে কি তরঙ্গে ভক্ত চিত্ত আকুলিত রে
সবাই মগন সেই ভাবে।
বহিল অশ্রুর শ্রোত দর দর ধারে রে
সাঙ্গ হ'ল কীর্ত্তন তখনে,
'রাধে রাধে রাধে' বলি গোরা নটবর রে
চলিলেন আপন ভবনে।
হেথা নিশি শেষে বসি বিষ্ণুপ্রিয়া
বিষাদে সখীরে সুধায়—

(১)

রামকেলি—লোভা।

সখীরে, প্রাণনাথ এল না এখন
নিশান্ত হইল মরি! করি জাগরণ।
কুসুম চন্দন রাশি বাসি হ'য়ে গেল!
সজ্জিত কোমল শয্যা অপরশ রৈল!
ওই বুঝি তারা রাজি আকাশে ডুবিছে,
ধীরে ধীরে ধীরে ঊষা সমীর বহিছে।
পূর্ব্ব দিকে ওই বুঝি উঠে দিনকর,
না সেবিয়ে পদযুগ দহিছে অন্তর।
বিরহ বিধুরা বালা করিছে রোদন,
অচ্যুত-আনন্দ গোরা করে আগমন।

(২)

বিভাষ—একতালা।

সুধীরে পশিল ঘরে গোরা দ্বিজরায় ;
বসিয়া পালঙ্ক পরে প্রিয়ারে সুধায়।
অভিমান ভরে প্রিয়া হেরিয়া পতিরে
দূরেতে সরিয়া ধনী গেল ত্বরা করে।
রসময় গোরাশশী সে ভাব বুঝিয়া,
প্রেমরসে ভাসি পাশে আনিল হাসিয়া ;
পতির পরশে মান-আগুন নিবিল,
স্থিরা অচঞ্চলা বালা বসিয়া রহিল।
হেরিয়া সোয়াগে গোরা তারে আলিঙ্গিল,
পালঙ্ক উপরে দোঁহে শয়ন করিল।
নিশি শেষে সমীরণ বহে ধীরে ধীরে,
মুক্তাকাশে হাসে শশী যুগলেরে হেরে।

(৩)

বিভাষ—একতালা।

প্রাণনাথ ! তুমি বড়ই কঠিন
(তব) দয়ালেশ নাই।
থাক সাধু সনে কীর্ত্তন নর্ত্তনে
রহি আমি পথ চাই।
কত পরিশ্রম নিশি জাগরণ
ভাবিয়া পরাণ দহে ;
আমি যে হেথায় চাতকিনী প্রায় ;
কিবা আসে যায় তাহে ?

ধীরে ধীরে শশী তমসায় পশি
যখনে লুকায় মুখ,
নিরাশা পবন বহিয়া তখন
ভেঙ্গে দেয় মম বুক।
প্রিয়ার বচন করিয়া শ্রবণ
গৌরাঙ্গ সোয়াগ ভরে,
আদর করিয়া বলে প্রাণপ্রিয়া
ক্ষমা কি দিবে গো মোরে ?
ভকতের সনে মধুর কীর্ত্তনে
ছিনু যে আবেশ রসে,
(এবে) পরম হরিষে প্রেমের লালসে
আসিনু তোমার পাশে।
অচ্যুত আনন্দ প্রভু গৌরচন্দ্র
নিশি শেষে প্রিয়া সহ,
কোমল শয্যায় শুয়ে নিদ্রাযায়
বহে মন্দ গন্ধ বহ।

(৪)

সখীর উক্তি—(জাগরণ)।

ভৈরবী—দাস পাহিড়া।

জাগ জাগ প্রাণসখি ! জাগহ এখন ;
উঠিয়াছে ভানু ওই লোহিত বরণ।

কোকিলের কুহুরব ভ্রমর গুঞ্জন,
ধীরে ধীরে বহিতেছে মৃদু সমীরণ।
কুসুম নিচয় কত কৌতুকে হাসিছে;
প্রেমে মত্ত হ'য়ে যেন সঘনে নাচিছে।
জাগিয়াছে শচীমাতা, আর ভক্তগণ,
উঠ সহচরি! তা'রা আসিবে এখন।
সখীর আহ্বানে আঁখি মেলিয়া চাহিলা,
পতিমুখ হেরি প্রেমে বিভোর হইলা।
অচ্যুত আনন্দ গোরা শুনি সখীবাণী,
জাগিয়া নয়ন মেলি করে হরিধ্বনি।

(৫)

ললিত—লোভা।

শয়ন ত্যজিয়া উঠ প্রাণ সহচরি!
এস এস ত্বরা করি পোহাল সর্ব্বরী।
ফুটিয়াছে সরোবরে কমল নিকর,
ছুটিতেছে চারিভিতে যতেক ভ্রমর;
বিয়োগিনী বিহগিনী আকাশে উড়িছে,
সোণার বরণ ভানু উদয় হ'য়েছে।
আলোক বিলোকি লোক শয়ন ছাড়িয়া
উঠিয়াছে; এস সখি আলস ত্যজিয়া।
শুনি সহচরী-বাণী উঠিলেন ধনী;
সম্বরি মুক্ত কবরি চলিলা অমনি।

(৬)

বিভাষ—একতালা। (প্রাতঃক্রিয়া।)

শয্যা তেয়াগিয়া গোরা বিনোদিয়া
গৃহের বাহির হইল ;
প্রভাত কিরণে নির্ম্মল গগনে
ফুটিয়া কি ছবি উঠিল ! ধ্রু !
আনন্দে নেহারি সুবিমল বারি
সযতনে ভৃত্যে রাখিল ;
মুখ প্রক্ষালন আদি সমাপন
করি গৌরহরি বসিল।
(তখন) যতেক চকোর হেরি জলধর
বারি বিন্দু আশে আসিল।
প্রসন্ন বদনে মধুর গুঞ্জনে
কলকণ্ঠে কত গাইল।
প্রাণের নিতাই মুকুন্দ গদাই
শ্রীবাসাদি আসি পশিল ;
শ্রীধর মুরারি আর নরহরি
কি আনন্দে সবে মিলিল।
ভাসি প্রেমজলে হিল্লোলে হিল্লোলে
পুলকিত চিত নাচিল ;
হাসি মন্দ মন্দ অচ্যুত আনন্দ
গৌরাঙ্গ সবারে তোষিল।

শ্রীগৌর সুন্দর রসিক শেখর
কৃষ্ণপ্রেম মহার্ণবে।
ভুলিয়া সবায় বাতুলের প্রায়
সতত থাকিত ডুবে॥
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া ভাব নিরখিয়া
অন্তরে ব্যথিতা হয়,
একদিন এক সখী সম্বোধিয়া
বিষ্ণুপ্রিয়া কিছু কয়।—
সখি! একি হ'ল দায়!
বুঝিতে না পারি বল গো কি করি
আছি মর্ম্মে মরি, কি যাতনা হায়!
প্রাণনাথ মোর রসিক শেখর
প্রফুল্ল অন্তর, সদায় যাঁর;
কি অভাবে এবে দিবা রাতি ভাবে,
থাকে গো নীরবে, কি দুঃখ তাঁর?
নাহি বলে কথা করি হেঁট মাথা
রহে যথা তথা, বিষাদময়!
না মানে বারণ, তাঁর দু নয়ন
যেন বর্ষাঘন, ঝরিতে রয়।
(আমি) হেরিতে যে নারি, কেমনে কি করি
বল সহচরি! বল রে মোরে;
ধৈরজ না ধরে হৃদয় বিদরে
বঞ্চিব কি করে? বলগো মোরে।

(হায়) সখীর রোদন হৃদয় বেদন
শুনি সহচরি আকুলা হ'ল ;
দোহে একমনে বসিয়া নির্জ্জনে
গৌর গুণগানে মাতিয়া গেল।

চতুর্থ সর্গ

সূচনা।

মহাগিরি গর্ত্তস্থিত বাস্পরাশি যবে
আন্তর সন্তাপে উঠে প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে,
পুঞ্জিভূত ধূমরাশি থরে থরে থরে
উঠে আচ্ছাদিয়া নভঃ ক্রমে ধীরে ধীরে ;
করে তমসার সৃষ্টি সঞ্চারিয়া ভীতি,
বাজাইয়া মৃত্যুভেরি—অন্তকের গীতি।
নদীয়ার ভক্তগণ ভাবের সাগরে
সাঁতারিতে ছিল সবে বাহু বিসরিয়া ;
শিশুকুল খেলে যথা হইয়া আকুল
করি গলাগলি মিলি সকলে আনন্দে।
সে সবার হৃদাকাশ ধূমে আবরিল
জাগাইয়া ত্রাস ভীতি ভূকম্প চলিল।
ছুটিল বহ্নির স্রোত দহিল নির্ম্মমে
ক্রীড়ারত দেবশিশু নির্ম্মল সরল।

যবে মহামহীরুহ উন্নত মাথায়
আকাশ ভেদিয়া রহে আপন গৌরবে,
শাখা পল্লবাদি থাকে প্রফুল্লিত তার,
পাদপের গরিমায় গৌরব সবার ;
ছিল নদীয়ায় ভক্তদল অবিচল
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে সতত বিহ্বল ;
আশ্রয়ে কৃপায় যাঁর আছিল নিঃশঙ্ক,
হায় তাঁর লীলায় কি বিষাদের অঙ্ক !
দুরীতে ধরার ভার আবির্ভাব যাঁর,
সে কি সহিবারে পারে পাপ অনাচার ?
পতিত দুর্গত তরে যাঁর অশ্রু ঝরে
সে কি স্বার্থ সুখার্ণবে সাঁতারিতে পারে ?
কাঁপিয়া উঠেছে ওই অগ্নিগর্ভ গিরি,
কাঁপিছে আশ্রিত যত পাদপ বল্লরী ।
যবে নদীয়ায় নরোত্তম বিশ্বম্ভর
হেরিলেন দীননেত্রে পতিত দুর্জ্জনে
কাঁদিল কোমল প্রাণ ; যথা জননীর
তনয়-দুর্গতি হেরি নেত্রে বহে নীর ।
জগাই মাধাই ছিল পাপী অনাচারি,
ধুইলা তাঁদের তাপ করুণা সঞ্চারি ।
কুলীন ও বিদ্যাগর্ব্বী তার্কিকাভিমানী
ততোধিক হীনচেতা পর প্রপীড়ক
আছিল দাম্ভিক যত এ ধরার ভার
অপরাধ তা' সবার ধরি শির'পরে,

প্রতিনিধিরূপে প্রায়শ্চিত্তা করিবারে
মস্তক মুণ্ডন করি—করি গৃহত্যাগ
ইচ্ছিলেন দ্বারে দ্বারে ধরি দীনবেশ
ফিরিবেন, সাজাইয়া হরিনাম তরি
সযতনে, যে তরিতে আরোহণ করি
পাপী তাপি পঙ্গু যাবে অনায়াসে তরি।

যে পুরুষোত্তমগণ উন্নতির তরে
সতত চিন্তিত, তাঁর অন্তর কেমন
কি বুঝিব মোরা ? সেই কোমল হৃদয়ে
কেমন করুণা ধারা বহে অহরহঃ
গৌরাঙ্গ সুন্দর তাই নরত্রাণ তরে
কাঁদিয়া আকুল কৃষ্ণকৃপা লভিবারে।
"কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন কার্য্য নাহি হয়"
কৃষ্ণের কৃপায় পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘয়।
কৃষ্ণের স্মরণে কৃষ্ণ বিরহ জাগিল
শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে গোরা বিহ্বল হইল।
হায় কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ, কোথা গেলে পাব ?
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে আমি কেমনে বঞ্চিব ?
প্রাণপ্রিয় গদাধরে পাশে নেহারিয়া
গদ গদ বাক্যে গোরা কহে বিনাইয়া ;—
"নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি,
দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবন ভূমি।
এ ছার সংসারে আমি কেমনে রহিব ?

নন্দের দুলালে আমি কোথা গেলে পাব ?”

(লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল)

উপস্থিত ভক্ত যত নীরবে শুনিল,
নীরবে সবার অশ্রু ঝরিতে লাগিল ;
সঞ্চিত শিশির বারি পদ্মপত্রে স্থিত
সমীরণ সন্তাড়নে যথা ঝরি পড়ে।
কি এক উত্তপ্ত স্রোত আকাশে খেলিয়া
করিল কি জ্বালাময় বিশ্বচরাচরে !
শ্বাস রুদ্ধ সবাকার ! হবে কি বিধান !
মাথায় পর্ব্বতপাত ! প্রাণ আনচান !

প্রথমে সম্বরি অশ্রু মুরারি কহিলা
শোকে বাক্য বিজড়িত কি আর কহিব
স্বতন্ত্র পুরুষ তুমি, তবু ও হৃদয়
পরম করুণ, তাই বলি ও চরণে
স্বহস্ত রোপিত শ্যাম সুকোমল তরু
কেহ না ছেদয় ; যদি যাও গো ছাড়িয়া
“মরিব আমরা সবে হৃদয় ফাটিয়া।” (চৈঃ মঃ)
শুখায়ে গিয়েছে অশ্রু গদাধর নেত্রে ;
মুখে বাক্য নাই ! নাহি জীবনে মমতা !
দুর্জ্জয় ভীষণ ব্যাধি ক্ষিপ্ত পরাক্রমে
আক্রমিয়া বিদলিত ভর্ত্তায় করিলে,
পতিব্রতা-প্রাণে জ্বলি কি বহ্নি সুতীব্র,
ভস্মীভূত করে তার সুকোমল প্রাণ।

গদাধর হেন হায় বহ্নি-দগ্ধ প্রায়,
গৌরাঙ্গ বিহনে প্রাণ ত্যজিবেন বলি
সুদৃঢ় সঙ্কল্প করি বন্ধু মুকুন্দের
গৃহে ছুটি গিয়ে তাঁরে কহিলা কাঁদিয়া—

(পাহিড়া)

"প্রাণের মুকুন্দ হে !—
আজি কি শুনিনু আচম্বিত।
কহিতে পরাণ যায় মুখে নাহি বাহিরায়
গৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ। ধ্রু।
ইহাত না জানি মোরা সকলে মিলিনু গোরা,
অবনত মাথে আছে বসি।
নিঝরে নয়ন ঝুরে বুক বাহি ধারা পড়ে,
মলিন হৈয়াছে মুখশশী॥
দেখিয়া তখন প্রাণ সদা করে আনচান
সুধাইতে নাহি অবসর ;
ক্ষণেকে সম্বিত হৈল ; তবে সবে নিবেদিল,
শুনিয়া দিলেন এ উত্তর।
আমি ত বিবশ হৈয়া তাঁরে কিছু না কহিয়া
ধাইয়া আইনু তব পাশ ;
এই ত কহিনু আমি ; যে করিতে পার তুমি ;
মোর নাহি জীবনের আশ।"
শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে হিয়া থির নাহি বান্ধে
গদাধরের বদন হেরিয়া।

(শুনি) শ্রীগোবিন্দ ঘোষে কয় ইহা যেন নাহি হয়,
তবে মুইও যাইব মরিয়া।' (পঃ কঃ তঃ)

(তখন) বক্ষে করাঘাত করি হায় হায় হায় রে
তরাসে মুকুন্দ তথা ধায়।
চাহিয়া চাহিয়া গোরা পানে
কিছু না বলিতে পারে ধারা দুনয়নে।
দুঃখে বিক্ষোভিত বক্ষঃ বিদারিয়া যায়!
কি সুধাবে? বিশ্চিক দংশন জ্বলে হায়!
দেখে ভগ্নকণ্ঠে কহিছে গৌরাঙ্গ :—

(পাহিড়া)

"প্রাণের মুকুন্দ হে!—
তোমরা কি সুধাও আমায়?
যে দুঃখ মরমে পাই কহিবারে নাহি ঠাঁই,"
ইহা বলি কাঁদে গোরা রায়।

* * * *

"পণ্ডিত পড়ুয়া যারা কিছুই মানে না তারা
উপদেশ কিছু নাহি লয়।
অনেক চিন্তার পর দড়াইনু এ অন্তর
আমি ত্বরা ছাড়ি গৃহবাস,
মস্তক মুণ্ডন করি এ ডোর কৌপীন পরি
অবিলম্বে লইব সন্ন্যাস।"

* * * *

প্রভু যবে হেন কৈল মুকুন্দ মুর্চ্ছিত হৈল,
কতক্ষণে সম্বিত পাইলা।

(তখন) শ্রীগোবিন্দ ঘোষে কয় 'এ তব উচিত নয়
সাঙ্গ করা নদীয়ার লীলা।" (পঃ কঃ তঃ)

বিরলের এ বারতা না র'ল গোপন
নিতাইরে বলে তবে শচীর নন্দন :—
"তোমারে কহিব এই আপন হৃদয়,
গার্হস্থ্য সব মুই ছাড়িব নিশ্চয়।
ইথে কিছু দুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে ;
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস কারণে।
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে,
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে।" (চৈঃ মঃ)

তখন—

শুনি নিত্যানন্দ সেই শিখার মুণ্ডন,
বিদীর্ণ হইল যেন দেহ প্রাণ মন।
নিত্যানন্দ বলে "প্রভু তুমি ইচ্ছাময়,
যে তোমার ইচ্ছা মনে সেই সে নিশ্চয়।" (চৈতন্যমঙ্গলে)
হ'তেছিল যবে এই দারুণ প্রসঙ্গ
যবে ভক্ত হৃদে হেন বিষাদ তরঙ্গ
ভীমনাদে ছুটিতেছে উলটি পালটি,
চিত্তক্ষেত্র শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সেইক্ষণে
আতঙ্কেতে কি জানি কি এক অজানিত
উঠিল কাঁপিয়া ; নীর নির্ঝর নয়নে !
পুঞ্জিভূত বাষ্পরাশি ভূগর্ভে সঞ্চিত
বাহির হইতে যথা কাঁপায় ধরায়,

সে কম্পনে ক্ষণে ক্ষণে উৎক্ষেপণে আর
আচ্ছাদয়ে নভঃ, বরিষয়ে অনিবার।

তখন – (প্রাচীন পদে)

"বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গিনীরে পাইয়া বিরলে,
ব্যাকুল হিয়ায় গদ গদ কিছু বলে,
আজি কেন নদীয়া উদাস লাগে মোরে,
অঙ্গে নাহি পাই সুখ, দুটি আঁখি ঝুরে।
নাচিছে দক্ষিণ অঙ্গ দক্ষিণ নয়ন,
খসিয়া পড়িল মোর কর্ণের ভূষণ।
সুরধুনী পুলিন মলিন তরুলতা,
ভ্রমর না পায় মধু, শুকাইল পাতা।
এই ভয় বড় লাগে বামুর হিয়া মাঝে,
নবদ্বীপ ছাড়ে পাছে গোরা দ্বিজরাজে।"

ওদিকে মায়ের চিত্তে তেমতি আতঙ্ক
নিপীড়িত সন্তাপিত করিতেই ছিল!
তখন নিমাই নিজ গৃহেতে পশিয়া,
অপরাধী প্রায় হেঁট মাথে দাঁড়াইল।
চৌর্য্য অপরাধী ধৃত তস্কর যেমন
ধর্ম্মাধিকরণে নীত, দাঁড়ায় তরাসে!
হেরিয়া পুত্রের ভাব শচী অনাথিনী
—হারাই হারাই করে অন্তর যাঁহার—
কহিলা কাতরে—কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী—
অস্পষ্ট জড়িত কণ্ঠ—কি করুণ ধ্বনি!

১৩০৮ বঙ্গাব্দে
নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

৩১শ বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা
পৌষ ও মাঘ ১৩৩৯

সম্পাদক
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন।

বিনীত নিবেদন

বর্ত্তমানে দেশে দারুণ অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত। ছোট বড় সকলকেই কিছু না কিছু এজন্য ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। "ভক্তি" পত্রিকার গ্রাহকবর্গের মধ্যে অনেকেই এই কারণে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভক্তির মূল্য পাঠাইতে পারিতেছেন না ইহা আমরা বুঝিতেছি, তথাপি তাঁহাদিগের প্রদত্ত ভক্তির বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড়টী টাকাই যে, এই ভক্তি-প্রকাশের দ্বারা ধর্ম্ম-প্রচারের ও একটী প্রাচীন বৈষ্ণব পত্রিকার জীবন রক্ষার প্রধান সম্বল তাহা আমরা ভুলিতে পারি নাই, তাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, এখনও যাঁহারা বার্ষিক মূল্য পাঠান নাই একটু চেষ্টা করিয়া এই সময় উহা পাঠাইয়া আমাদিগের কার্য্যের সহায়তা করুন। ডাক: মাশুল বৃদ্ধি হেতু অন্যান্য বারের ন্যায় প্রত্যেককে পৃথক পৃথক অনুরোধ পত্র পাঠাইতে পারিলাম না, সাধারণ ভাবে এই নিবেদন জানাইলাম।

বিনীত—কার্য্যাধ্যক্ষ "ভক্তি"

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা।
নমুনা প্রতি খণ্ড ৵০ তিন আনা, ভিঃ পিতে ১৵০ আনা

সূচীপত্র

সম্পাদক কর্ত্তৃক মাসিক "ভক্তি-নিকেতন" পোঃ আন্দুল-মৌড়ী হাওড়া হইতে প্রকাশিত
ও কলিকাতা ৭৭নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

৩১শ বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | ভক্তি | পৌষ ও মাঘ ১৩৩৯
ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

দিব্যজ্ঞান

(শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বসাক।)

যাদের তোমাকে না দেখি ভজিতে সত্যই তারা কি ভজে না ?
অথবা আমার ভক্তি নাই ব'লে মোরপ্রাণ তাহা বোঝে না ॥
দিবালোকে যেন পেঁচক পাখীরা নয়নমুদিয়া ভাবে হে।
তারা যদি কয় 'সূর্য্য কিছুনয়' তা'হলে তাই কি হবে হে ॥
আমি মনে করি আমি তোমা ভজি সে শুধু মনেই করা হে।
ভজনতো যত মনকলা খাওয়া অভিমানে বুক ভরা হে ॥
অভিমানে শুধু অহংই ফুটিবে নিরুপাধি জ্ঞান ঢাকি হে।
চিন্ময়ানুভূতি গোবিন্দ স্ফূর্ত্তি পায় না সেখানে থাকি হে ॥
বুঝিলাম মোর ঘুচে নাই কভু তোমাতে বিমুখ ভাব হে!
তোমাতে সর্ব্বদা উন্মুখ না হ'লে কেমনে হইবে লাভ হে ॥
আমি অভিমানে যাহাই করিব তাই-ই যদি হেন হয় হে।
তবে কি তোমার কৃপায় বঞ্চিত, লাগিছে অন্তরে ভয় হে ॥
তাই—
তোমাতে যাঁহারা সকল সঁপিয়া তন্ময় ক'রেছে প্রাণ হে।
তাঁদের শ্রীপদ-ধূলিরাশী দিয়ে আমারে করাও স্নান হে ॥
তাতেই আমার যাইবে ধুইয়া অনাদি বিস্মৃতি রোগ হে।
তখনি দেখিব আব্রহ্ম কীটানু তোমাতেই যোগাযোগ হে ॥

শ্রীশ্রীগৌর-বক্ষ-বিলাসিনী

(শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মোহন রায়।)

শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোরচন্দ্র,
হা নাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র।
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্ত-চোর,
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর॥

আনন্দ রস-বিলাসে প্রমত্ত গৌর বিশ্বম্ভর পিতৃপিণ্ড প্রদানে গয়াক্ষেত্রে গেলেন; আর সেখান হইতে প্রেমভক্তির প্রস্রবন লইয়া আসিলেন নবদ্বীপে। সেই রসে ডুবিল যত ভক্ত মকরের দল। তখন নিশি দিশি ভক্ত-আবেশে "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন ও মূর্চ্ছা; আর ঘন ঘন হুঙ্কার গর্জ্জন। আত্মহারা পাগল নিমাইর অবস্থা, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। গয়া হইতে আসিয়া নিমাইর এ কি অবস্থা হইল, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী পাগলিনী পারা। শচীমায়ের অবস্থা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে। যথা—

পুত্রের চরিত্র শচী কিছু নাহি বুঝে।
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গাবিষ্ণু পূজে॥
স্বামী নিল কৃষ্ণচন্দ্র নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সবে মাত্র আছে একজন॥
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ দেহ এই বর।
সুস্থ চিত্তে গৃহে মোর রহুক বিশ্বম্ভর॥

বিশ্বম্ভর-জননী শচীমাতা গঙ্গাবিষ্ণু পূজা করিয়া, বর প্রার্থনা করেন, পুত্র স্ব-ভাবে ফিরিয়া আসুক, তাহার অসুস্থ চিত্ত সুস্থ হউক ইত্যাদি।

যদিও নিমাইর এ ভাবটী কৃষ্ণপ্রেমের বিমল উৎস, তথাপি অতি স্বজন জননী ও ঘরণীর নিকট তাহা অস্বাভাবিক। তাহারা চায় প্রাণের অভিলষিত মুরতি নদীয়ার চাঁদ গৌরাঙ্গকে। তাই শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর স্বভাবের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে নিমাইর এই অস্বাভাবিক ভাব। শচীমাতা বধুকে আনিয়া পুত্রের সমীপে বসান কিন্তু প্রভু নদীয়ার বাহিরের ভাবে বিভাবিত বলিয়া সে রস সম্বরণ করিয়া, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া হুঙ্কার গর্জ্জন করেন। তাহাতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী এবং শচীমাতা ভয় পান। তাঁহারা চান প্রাণের নিমাইচাঁদের সহজ সুন্দর ভাব, রস, গমন, ভাষণ ইত্যাদি। সেই স্বভাব সুন্দর হাস্য, বাক্য, রূপলাবণ্যে যাহাদের দেহ মনপ্রাণ সুগঠিত ও সঞ্জীবিত, তাহারা ভুলিবেন কিম্বা সুখ পাইবেন কেন? বেদোক্ত রুক্মবর্ণ ব্রহ্মযোনি পরম পুরুষই গোলোকাধিপতি শ্রীগৌরাঙ্গ। যথা শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে :—

বৈকুণ্ঠ উপরি স্থান, গোলোক তাহার নাম,
গৌরাঙ্গ সুন্দর তায় রাজা।
লখিমী অধিক নারী কি কহ পুরুষ স্তিরি,
সুখময় সকল পরজা॥ ইত্যাদি

এই গৌর বিশ্বম্ভর রূপই তাহার একমাত্র স্বরূপ। যথা—শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নামে :—

স্বরূপে তোমার হয় গোলোকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ কমলার পতি॥
বৃন্দাবনে কর লীলা ধরি গোপবেশ।
সে লীলার অন্ত কভু, নাহি পায় শেষ॥ ইত্যাদি

সর্ব্ব অবতারসার যেমন গোরা, তাঁহার ভুবনমোহন রূপ ও সর্ব্ব-রূপের সেরা। শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠা শ্রীমতি বৃষভানুসুতা রাধারাণীও বিমোহিত হইয়া মজিয়া ছিলেন এই গৌর সুন্দর হেরিয়া, নিধুবনে। সব অবতারই গৌর স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ সমস্তই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রভাব, বৈভব, বিলাস ও প্রকাশের বিভিন্ন লীলা খেলা। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের পরিপূর্ণা শক্তি, মূর্ত্তিমতী ভক্তি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, অন্য রূপে ভুলিবেন কিম্বা মজিবেন কেন? রুচি ও ভাবভেদে প্রভুর প্রত্যেক লীলাই মহান্; কিন্তু একনিষ্ঠজনের কথা স্বতন্ত্র। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিপ্রেম সম্পত্তি একমাত্র বিষ্ণুপ্রিয়া। তাহার হ্লাদিনী ও সন্ধিনীর সার ভক্তিদেবীর কৃপা ভিন্ন ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অধিকার নাই কাহারও। এই সচ্চিদানন্দ পরম কৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গই বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা ও বৈকুণ্ঠাদি ধামে অনন্ত কালাবধি নিত্য লীলা করিতেছেন। তত্তদ্ধামাদিতে গৌর ঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও প্রাণনাথের ভাবরসানুযায়ী শক্তি প্রকাশ করিয়া লীলা খেলার সহায়তা করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্ব অবতার সার শিরোমণি, লাবণ্যরসময় বিগ্রহ। তাঁহার বক্ষবিলাসিনী বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে, রসে, হাবে, ভাবে সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন তাঁহার। প্রভু, প্রিয়াজীর সহিত নিত্য মিলিত ও বিলাস রসে সতত যুক্ত। শ্রীপ্রভু নিজ মুখে প্রিয়াজীকে বলিয়াছেন, যথা—শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে,—

শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমায়ে কহিল ইহা,
যখন সে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই, থাকিব তোমার ঠাঁই,
এই সত্য কহিলাম দঢ়॥

গোলোক ও নবদ্বীপ অভিন্ন। গোপীব্রজ বৃন্দাবন হইতে ভক্তিব্রজ নবদ্বীপ ধামের মহিমা ও রস অধিক। ইহা একনিষ্ঠ গৌরভক্ত শ্রীঅদ্বৈত-

তনয় অচ্যুতানন্দের বাক্য। শ্রীশচীমাতা সর্ব্ব অবতারে প্রভুর মাতা অর্থাৎ তিনি সর্ব্ব জননীর সার। তিনি সর্ব্বভাবে জানেন এবং প্রভুর লীলা আচরণ দ্বারা বিশেষ ভাবে অবগত আছেন, আপন পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া, গৌরহৃদয়ে নিত্য বিরাজ করিতেছেন। শ্রীপ্রভুর মর্ম্মি ভক্তগণ সর্ব্বদা দর্শন ও উপলব্ধি করেন, শ্রীশচী-মন্দিরে প্রেমরস বিলাসে শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্ন কলেবর প্রেমদাতা নিত্যানন্দ হইতেই এ তত্ত্বের প্রকাশ! নিত্যানন্দের বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল শচী আঙ্গিনায়। অবধূত নিত্যানন্দ থাকেন শ্রীবাসের বাড়ীতে আর শ্রীবাস গৃহিণী মালিনী পুত্রপ্রায় অন্ন যোগাইয়া থাকেন। নিত্যানন্দের সদা বাল্য ভাব, আর মালিনীর স্তনদুগ্ধ পান করেন। বৃদ্ধা মালিনীর স্তনে দুগ্ধবিন্দু নাই, নিত্যানন্দের পরশে স্তনে দুগ্ধ ঝরে। নিত্যানন্দের অচিন্ত্য প্রভাব অসংখ্য। তিনি প্রভুর গূঢ় মর্ম্ম জানেন এবং গৌরাঙ্গের নাম ও ভজন সর্ব্বত্র অবিচারে দান করিয়া প্রভুর উদ্দেশ্য ও আদেশ পালন করেন। প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়া সহ নিশি দিশি আনন্দ রসে ভাসমান। প্রভুর আনন্দে প্রিয়াজীও আত্মহারা। শচী আঙ্গিনায় প্রিয়াজীদত্ত তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে প্রাণপ্রিয়াসহ কতই না রস আলাপন হয় নিত্য প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের।

শ্রীবাসের বাড়ী হইতে নাচিতে নাচিতে তথায় উপস্থিত হইয়া, হঠাৎ সে যুগল রূপ-রস-মাধুরী দর্শন করিলেন আমার পাগলা নিতাই। গৌর-প্রেমে নিশি দিশি পাগলা নিতাই, আরও অধিকতর পাগল হইলেন যুগলরূপ দর্শন করিয়া। নিতাইর কৃপা না হইলে এই যুগল রূপ দর্শন ও আস্বাদনের অধিকার নাই কাহারও। বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হওয়ায় নিতাইর আনন্দ আর ধরে না; তাই উলঙ্গ হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। বাহ্য জগত ভুলিয়া গিয়াছেন, তা দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া সরিয়া

পড়িয়াছেন। কারণ নিতাই চাঁদ, গৌর সুন্দরের বড় ভাই। সম্পর্কে প্রিয়াজীর ভাসুর। কত চেষ্টা করিয়া নিমাই, নিতাইর বসন পরাইয়া দিলেন। আর নিতাই একে আর উত্তর দিতে লাগিলেন প্রাণের ভাই নিমাই চাঁদের সঙ্গে। প্রকটাপ্রকট সর্ব্বাবস্থায় বিষ্ণুপ্রিয়া সহ রসবিলাস করেন শচীনন্দন গৌরহরি। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ মায়াপুর শ্রীশচী মন্দিরই এই যোগ-পীঠ স্থান। রসিক গৌরভক্তগণ সেই নিত্যলীলা অবিরত দর্শন ও ভজন করিতেছেন। যথা— শ্রীচৈতন্য ভাগবতে :—

আজাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥

সকল লীলা দর্শনে সকলের অধিকার নাই। অধিকারী ভেদে লীলা দর্শন ও অনুভূতি হয়। চারি রসের ভক্তগণ স্ব স্ব ভাব-রসে ইষ্ট বস্তুর মহিমা, গুণ ও লীলা আস্বাদন করেন। অধিকারের বাহিরে আলোচনাই নিষ্ফল ও বাহ্য কোলাহল। সে জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

উপাসনা ভেদে জানে ঈশ্বর মহিমা।
তার সাক্ষী সূর্য্য যৈছে দেইত উপমা॥ ইত্যাদি

শ্রীগৌর সুন্দর নবদ্বীপে শচী-মন্দিরে বিষ্ণুপ্রিয়া সহ নিত্য রসরাজ মহাভাব স্বরূপে প্রেম রসলীলা করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের স্বভক্তি শ্রী, নবদ্বীপময়ী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। তাহা সুরসিক মহাজনগণ সুসিদ্ধান্ত মত। শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলাপ্রকাশ করিয়াও এতত্ত্ব জগতে প্রচার করিয়াছেন। এক দিবস শচীমাতা স্বস্নেহে নিমাই ও নিতাইকে ভোজন করাইতে বসাইয়া সর্ব্ব উপকরণ-পরিপূর্ণ পাত্র দু'খানি সম্মুখে দিয়াছেন দোঁহার। আর তন্মুহূর্ত্তে দেখেন কি, ভিক্ষা ত্রিভাগ হইয়া গিয়াছে; আর নিমাই নিতাই দুইভাই হাসিতেছেন। শচীমাতা আরও নিগূঢ় প্রেম-রহস্য লীলা

দেখিলেন, আপন বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া ভোগের অংশ গ্রহণ করিতেছেন। ত্রিভাগ হওয়ার উদ্দেশ্য শচীমাতার আর বুঝিবার বাকী রহিল না। যথা—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে :—

আপন বধূকে দেখে পুত্রের হৃদয়ে।
সকৃৎ দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে॥

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে পৃথক্ ভোগ না দিলেও শ্রীশ্রীপ্রভুদ্বয়ের ইচ্ছায় তাহা পৃথক্ হইয়া গেল। শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ সহ সর্ব্বত্র তিনি পূজা ও ভোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন; এই লীলা দ্বারা প্রভুদ্বয় এ তত্ত্ব প্রচার করিলেন জগতে। আর এ লীলার সহায্যকারিণী হইলেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণা মাতৃশক্তি বিশ্বম্ভর জননী শ্রীশ্রীশচীমাতা। এই লীলা ও তত্ত্বটী যতই আলোচনা ও আরাধনা হইবে ততই জগতের মহামঙ্গল।

শচীমাতার কৃপা ভিন্ন এ সব নিগূঢ় প্রেমরস লীলা দর্শন হয় না কাহারও। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ তত্ত্ব। ইহাতে ভেদবুদ্ধি যার, সেই বিনাশ হয় অর্থাৎ ভক্তিপথ হইতে বিচলিত হয়। আর একদিন পূর্ণিমার গভীর নিশিথে মোহনমুরলী রব শ্রবণ করিয়া শচীমাতা হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন এবং গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন মদনমোহন রসরাজ স্বরূপে আপন পুত্র বাজাইতেছেন ত্রিভুবন আকর্ষণ মন্ত্রে সেই বেণু। বিষ্ণুমণ্ডপের দ্বারে নিমাই চাঁদের এই রাসরস লীলা দর্শন পাইলেন ভাগ্যবতী শচীমাতা। বহু লোকের নৃত্যগীত বাদ্যও শুনিলেন; এবং আরও চমৎকার দর্শন পাইলেন আপন পুত্র, গৌরবক্ষে জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলাভ্যন্তরে পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া। কারণ গৌরাঙ্গবিলাসীভিন্ন অন্য কাহারও স্থান নাই গৌরাঙ্গহৃদয়ে। ব্যাসবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাসঠাকুর এই মহাবাক্য সর্ব্বদা ঘোষণা করিতে করিতে অবিরত গান করেন :—

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ।
জীবগণ প্রতিকর শুভ দৃষ্টিপাত ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দাদেশে আপনি নমস্কার ও বন্দনা করিয়া জগতকে শিখাইতেছেন তাহার নিগুঢ় মর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি নমস্কার শ্লোক যথা :—

নমঃত্রিকাল সত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ।
স্বভৃত্যায় স্বপুত্রায় স্বকলত্রায়তেনমঃ ॥

আই যাকে শুভদৃষ্টিপাত করেন, এসব লীলা দরশনের অধিকারী হয় সে-ই। নদীয়া যুগলভজন শ্রীশচীমায়ের অন্তঃপুরে লুক্কায়িত অতি নিগূঢ় ও গুপ্ত মহাধন। ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তনাদি লীলারাস শচীমায়ের বহিরঙ্গনের লীলাখেলা। নদীয়ার বাহিরের লীলা খেলার ও বহু উদ্দেশ্য আছে প্রভুর। সে সব কথা স্বতন্ত্র। যে যাহার অধিকারী সে পাইবে তাহাই। এখন শ্রীশ্রীসাধুগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীপাদ পদ্মে সাষ্টাঙ্গে কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণিপাতান্তে বসন্তসাধুর বিরচিত একটী সিদ্ধভজন গানেরদ্বারা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করা হইল। যথা গান :—

গৌর গরবিনী গো।
নদে'লীলা কারিণী, গৌরবক্ষ বিলাসিনী গো ॥
শচীমায়েরগণ যারা, সুখ পায় না তোমা ছাড়া,
নদে'র বাহির যায় না তারা, গায় নদীয়ায় জয়ধ্বনি গো।
বিবর্ত্তবিলাসলীলা, সহজ ভাবে সাধিলা,
কিঞ্চিৎপ্রাণে জানাইলা ব'লে, 'বসন্ত' হ'ল কলঙ্কিনী গো ॥

পতিতের কথা

(শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার চট্টখণ্ডী ।)

(যখন) ডেকেছিলে দ্বারে এসে
দিইনি আমি সাড়া ;
(আমি) এমনই লক্ষ্মীছাড়া !
খোকা আমায় দিলে তুলে,
"দেখে এসো দুয়ার খুলে,
মোদের দ্বারে এলো বুঝি রাজা-মহারাজ।"
আমি রেগে ব'লেছিলাম
"ঘুমাতে দে আজ।"
পাগলামি আর বলব কাকে ?
নাইক কোন কাজ
পথে পথে ঘুরে বেড়ায়
রাজা মহারাজ !
দেখছে যারে পথের পরে
ছুটেগে তার দু'হাত ধরে'
সবার পায়ে ধ'রে মরে
বলে 'হরি বল ভাই'—
ওর কাজত কিছুই নাই !
সবাই বলে এত বড় পণ্ডিত কেউ নাই ;
বামুন হ'য়ে মেথর মুচির পায়ে ধরে তাই !

অমন ঘরের ছেলে
মায়ের কথা ঠেলে
বলে কিনা "এবার থেকে
ঘুরব দেশে দেশে।"
মুখ্খু কি আর এমন কথা
সুধায় মাকে এসে ?
বাপ মা শিখায় লেখা পড়া
(ছেলে) মানুষ হবে ব'লে
সংসার ধর্ম্ম করে যাবে
সুখেতে দিন চ'লে।
এইত কথা আসছি শুনে
বাপ পিতামোর মুখে ;
কালে কালে দেখব কত !
হাসিও পায় দুখে।
শুনি প্রেম বিলায়ে যায়
এমন কথা, ছি, ছি কারও সাম্‌নে বলা যায় ?
এ সমস্ত আর কিছু নয় কু শিক্ষারই ফল
বিদ্যে শিখে চরিত্রহীন, বলব কি আর বল।
এতবড় পৃথিবীতে আরত কোথাও নাই
ওর প্রেম বিলাবার ঠাঁই,
প্রেমের বোঝা মাথায় নিয়ে
তাইত লোকের দ্বারে গিয়ে
জমিয়ে আসে পাড়ি ;
(এসব) বড়ই বাড়া বাড়ি।

শুনেছিত কৃষ্ণ নাকি
দ্বাপরের শেষে
এমনই করে জ্বালিয়ে ছিল
বৃন্দাবনে এসে।
এবার এলে একটুখানি
কড়্‌কে দিতে হবে
দেখতে হবে এ ব্যবসা তার
কদ্দিন আর রবে।"

[২]

সুখের দিনে তোমায় কত
দিছি গালাগালি
তোমার মাথায় দিছি তুলে
অপমানের ডালি ;
যত কটুকথা বলেছি এ মুখে
তুমি তত মোরে নেছ তুলে বুকে
তব বুকে থেকে উঠিয়াছি রুখে
(তবু) বুকহ'তে মোরে ছাড়নি ;
কত পাপ মোর সব কেড়ে নেছ
(শুধু) স্নেহটুকু তব কাড়নি।
এত দয়াতব ওগো দয়াময় !
কেমন করিয়া মানুষেতে হয় ?
কেবা তুমি শুধু দেহ পরিচয়—
বড় পরাণের সাধ ;

কার প্রেমনীরে তব হৃদিভাসে ?
এত আঁখিলোর কোথা হ'তে আসে ?
কেন স্নেহডোরে বেঁধেছ এ দাসে
ভেঙ্গে দে'ছ সব বাঁধ ?
ঘুরিয়াছি নানা দ্বারে ;
এমন করিয়া ডাকেনিত কেউ
চাহেনিত অভাগারে ?
সকলে দিয়েছে একই বারতা
বলে দে'ছে কাণে "শুননাক কথা
যদি প্রাণে তব থাকে হে মমতা
যেও নাক ওর কাছে ।"
বুঝিয়াছি আজ পরাণে পরাণে
তব নাম গান যে শুনেছে কাণে
সেত মরে নাই বেঁচে গেছে প্রাণে
বড় আনন্দে আছে ।
যদি দয়া করে ডেকেছ আমায়
(মোর) হৃদি হ'তে দিও মুছে লালসায় ;
বুকে নিও নাক, রেখ তব পায়—
তব পায়ে ঠাঁই চাই—
তব রাঙ্গাপায়ে আছে শুধু সাধ
আর কোন সাধ নাই ।

হাতুড়ের চিকিৎসা

(শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

হাতুড়ের চিকিৎসা বড় ভয়ানক। তা'তে রোগীর বিপদই অনিবার্য্য। তবে দৈব অনুকূল হইলে, শাপে বরের মত কদাচিৎ শুভ ফল হয়ে থাকে। সেটা চিকিৎসক বা চিকিৎসার গুণে নয়, ভাগ্যবলেই হয়। কিন্তু সেই ভাগ্যের দোহাই দিয়ে, সিদ্ধ সৎবৈদ্যের আশ্রয় ত্যাগ করে ঐরূপ হাতুড়ের কবলগত হওয়া মূর্খতারই পরিচয়।

আমরা এখন, স্বেচ্ছায় মৃত্যুফাঁসী গলায় বাঁধার মত, রোগের জ্বালায় অধৈর্য্য হয়ে, সিদ্ধ সাধু বৈদ্যের সঙ্গ ত্যাগ করে, এইরূপ একান্ত সৎশিক্ষা-দীক্ষা-হীন হাতুড়ের কবলে গিয়ে এইরূপ মূর্খতারই পরিচয় দিতে বসেছি। আমাদের চিকিৎসাও আরম্ভ হয়েছে তেমনি। রোগ কি, কি তার মূল, আর তার প্রকৃত ভেষজই বা কি,—সে বিষয়ে কোনও চিন্তা, কোনও সন্ধান না করেই, একটা উদ্‌ভট্—একটা উৎকট চিকিৎসা সুরু হয়েছে আমাদের অতি রুগ্ন সমাজ-শরীরে। সেই চিকিৎসার সর্ব্ববিধ ভেষজের ভিতর দিয়ে এক অতি সর্ব্বনাশকর ভয়ঙ্কর বিষ—বিজাতীয় বিষম বস্তু—কোথাও ছলে, কোথাও বলে প্রয়োগ করা হচ্ছে ঐ অবসন্নপ্রায় কলেবরে।

একটা ধারণা জন্মেছে, এ দেশের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মভেদটাই এদের সর্ব্বনাশের মূল। সুতরাং এদিগকে ঐ সর্ব্বনাশ হ'তে রক্ষা করতে হলে, সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রযত্নে ঐ ধর্ম্মটারই মূলোচ্ছেদ করে দিতে হবে। এই ধারণারবশেই এখন বহু হস্তে চারিদিক্ হতে, দুর্‌দার করে কুঠার পড়ছে

ঐ ধর্ম্মের উপর। আর ঐ আঘাতে তার অন্তঃসারহীন অতি দুর্ব্বল বহু অঙ্গ একবারে ভেঙ্গে পড়্ছে;—কোনটা একবারে গুঁড়িয়ে ধূলায় মিশে যাচ্ছে। কিন্তু, অন্য বহু অঙ্গ হতে ঐ কুঠারই দুম্‌ড়ে গিয়ে দূরে ঠিকুরে পড়্ছে; বজ্রনাদে দিগ্‌বিদিক্ কেঁপে উঠ্ছে ;—থর থর করে কাঁপিয়ে তুলছে ঐ উন্মত্ত কুঠারধারীদিগকে। তারা স্তব্ধ হয়ে শুনছে, ঐ সকল অজেয় অভেদ্য অশনি-দৃঢ় অঙ্গ, শত সহস্র মুখ বিস্তার করে, মহামেঘনির্ঘোষে সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করছে এইসব অভ্রান্ত মহাবাক্য।

হায় আত্মহারা, লক্ষ্যহারা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, শূদ্রেতর,—কিজন্য—কোন অভাবে, কোন অসুখে—অধীর হয়ে,—কোন পথে এত মত্ত বেগে, কোথায় চলেছ তোমরা? বল, চাই কি—প্রয়োজন কোন্ বস্তুতে! প্রয়োজন যাই থাক্ ;—এখন চাইতো তোমাদের ব্যাধি-বশে বিকার প্রাপ্ত বিভিন্ন অঙ্গের একতা—না? বুঝেছি; আগে ঐক্য হয়ে, পরে একযোগে ঐ প্রয়োজনের প্রতি অভিযান করবে; ঐ প্রয়োজন-পথের অন্তরায় ধ্বংস করবে?

উত্তম ;—এ কথা মন্দ নয়! কিন্তু, ঐ একতা লাভের জন্য, ঐ বিকার নষ্ট করবার জন্য, এ কি উপায় অবলম্বন কর্ছো? এ কোন্ পথ আশ্রয় কর্ছো? স্বাতন্ত্র্য, স্বাধিকার, শাস্ত্রাচার নষ্ট করে, লঙ্ঘন করে, স্বৈরাচারের আশ্রয় ল'য়ে, বিকার নষ্ট কর্বে? একতা লাভ কর্বে? সে অধিকার—সে অভেদ ভাব—সে একতা—কেমন হবে একবার ভেবেছ কি? ভাবোনাই নিশ্চয়; ভাব্লে—বুঝ্লে, এ বুদ্ধি কখনই হত না! এস,—প্রত্যক্ষ দেখাব আজ তোমাদের;—তোমরা এই পথে যে অবিকার—অভেদ ভাব,—যে একতা,—লাভ কর্তে এত উৎসুক, এত উন্মত্ত হয়েছে.—সেই অবিকার ভাবের—সেই 'একতার' —জীবন্ত জ্বলন্ত মূর্ত্তি!

ঐ দেখ,—কুৎসিত কলহ কোলাহল হলাহল পূর্ণ, ভীষণ অন্ধতামিস্র-তুল্য এক বেশ্যা পল্লী! ঐ দেখ, তারই এক স্থলে, একত্র বসে ভোজন কর্‌ছে কয়েকটী বারবিলাসিনী! দেখ, কেমন পাশাপাশি বসে, গায়ে গায়ে ঢলে পড়ে, পরস্পরের পাত হতে অমেধ্য ভোজ্য বস্তু কাড়াকাড়ি করে, কত আনন্দে আহার কর্‌ছে—এক চণ্ডাল কুল-ত্যাগিনী আর এক ব্রাহ্মণ কুল-কলঙ্কিনী। অন্যত্র ঐদেখ আবার,—এক যবনীর সঙ্গে, তার উভয় পার্শ্বে, এক উচ্চকুলজাত ধনশালী হিন্দু, আর এক জন মুসলমান বন্ধু কেমন অবাধ ইন্দ্রিয় তর্পণে তন্ময় হয়েছে! একই পাত্রে অকুণ্ঠায় সকলের সোপচার সুরাপান চলেছে!—সুরাবিপনী ও বিলাতী হোটেল প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এমনি দৃশ্য, দৃষ্টান্ত শত শত দেখ্‌তে পাবে।

এই—এই তোমাদের ঐ অপূর্ব্ব 'অভেদ ভাবের'—ঐ ভয়ঙ্করী 'একতার' জ্বলন্ত আদর্শ!!

এর গর্ভে কি বিজাতীয় ভীষণ ভেদ, কি ভয়াবহ অনৈক্য, কোন্ সর্ব্বস্বান্তকর ভয়াল অস্ত্র উদ্যত করে লুকিয়ে থাকে,—জান? পরস্পরের অতি ক্ষুদ্রস্বার্থে একটু সংঘর্ষ ঘট্‌লেই পলক মধ্যে ঐ অনৈক্য ঐ ভেদ, ঐ একতার—ঐ অভিন্নতার গর্ভ বিদীর্ণ করে, অগ্নিসংযুক্ত বিস্ফোরক বস্তুর মত, কিরূপ প্রচণ্ড আকারে জ্বলে উঠে;—আর তা'তে কি ঘোর অনর্থ উপস্থিত হয়;—তার কিছু খবর কি রাখ?—একটু চিন্তাও কি কর? দূর প্রত্যন্তের পানে একটু স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে, প্রতিগৃহে ঐ আগুনই কেথাও জ্বলছে, কোথাও নিব্‌ছে, নিব্‌তে নিব্‌তে আবার কোথাও ধুঁইয়ে শিখা বিস্তার করছে, কোথাও বা ভস্মের মাঝে লুকিয়ে রক্তমুখে গন্ গন্ করছে,—দেখ্‌তে পাও কি?

নিশ্চয় না! তা হলে কি আর এ বুদ্ধি হয়?—এমন সর্ব্বার্থ সার-সম্পদময় রত্নমন্দিরে,—এমন অখিলবিশ্বের বিস্ময়স্থল সর্ব্ব-শোভাসামর্থ-পূর্ণ

শান্ত তপোবনে,—নিজহাতে এমন নরকের বিষ,—এমন ধ্বংসের আগুন—এনে দিতে কি এত ব্যগ্রতা, এত মত্ততা আসে?

কিন্তু একটু থামো তোমরা,—আরও দু' একটী কথা শুন আমাদের। আগে আমাদের এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নরদেহের পানে একবার দৃষ্টিপাত কর,—দেখ, তাহার মস্তিক হইতে, জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণাদি অধে পাদ-পায়ুউপস্থ পর্য্যন্ত সর্ব্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, উচ্চাবচ বিভিন্নপদে বিভিন্নকার্য্যে থেকেও সকলে একযোগে কেমন আত্মার সেবায় সার্থক হয়ে আছে। কৈ পায়ুর ত তুণ্ডের সঙ্গে কি মুণ্ডের সঙ্গে কর্ম্মভেদ কি স্থানভেদ হেতু কোন দ্বন্দ বাধে না! বাধ্‌বে কেন? তারা ত তোমাদের মত আত্মধর্ম্মচ্যুত হয়ে, পরমার্থে লক্ষ্যহারা হয়ে, ক্ষুদ্রার্থের ইতরবিশেষ নিয়ে, তুচ্ছ খড়কুটির দ্বন্দ্ব নিয়ে, অন্যায় সংঘর্ষে আত্মঘাতী হতে যায় না। জানে তারা দেহরক্ষার জন্য ভিন্ন স্তরে ভিন্ন অধিকারে থাকিলেও, সেই এক আত্মার সঙ্গে সংযোগ সম্বন্ধ সকলেরই সমান; স্বাস্থ্য সুখেরও সমান অংশ ভাগী সকলে।

আমাদের এই সনাতন ধর্ম্মাশ্রিত সমাজ শরীরও এমনি। অবশ্য ঐ স্থূল ভাব হতে এই সূক্ষ্মভাবে বহু ভেদ আছে। এর বহু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বিভিন্ন বর্ণাশ্রমধর্ম্মী ও তা'দের সহায়তাকারী। এরা কর্ম্মবশে উচ্চনীচ স্থান ও অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে; কর্ম্মেই আবার উচ্চনীচ স্থানে বা অধিকারে উন্নতি কিম্বা অবনতি লাভ কর্‌বে। 'ব্রাহ্মণ', চণ্ডালকে কোলে তুলে বা মন্দিরে ঢুকিয়ে নিলেই চণ্ডালের চণ্ডালত্ব যাবে না। 'ব্রাহ্মণ' চণ্ডালের সঙ্গে একপাতে ডাল ভাত ভক্ষণ করলেই চণ্ডাল পবিত্র হয়ে বা ব্রাহ্মণ হ'য়ে পড়্‌বে না।

তা হবে কি করে? একটু ভেবে দেখলেই পাবে তোমরা,—সত্যপথ ছেড়ে এই ব্যভিচারে প্রবৃত্তি যখনই এসেছে; এই ভাবে এক হয়ে

যাবার কল্পনা ও কার্য্য চলেছে, তখনই ঐ 'ব্রাহ্মণ' ঐ শূদ্রের বা চণ্ডালের সমত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। শূদ্র কে ?

"সর্ব্বভক্ষরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্ম করোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতিস্মৃতঃ ॥"

(মহাভারতে শ্রীভীষ্মবাক্য, শান্তি ১৮৯।৭)।

—সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করতে, সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করতে সদা প্রবৃত্ত, বেদাচারত্যাগী, অনাচার অশুচি ব্যক্তিই শূদ্র।

সুতরাং ঐরূপে স্বয়ং পতিত ঐ ব্যক্তি অপর পতিতজনকে পবিত্র করবে বা উদ্ধার করবে কোন্ বলে ?

তবে যদি বল, দূর হোক তোমাদের ঐ পতিত উদ্ধার, ঐ পবিত্রতা। আমরা চাই এখন একতা—সব অভেদ এক হয়ে যাওয়া, তার-ই তরে আমাদের এই চেষ্টা এই কার্য্য।—বেশ !—এই পথে, এই সংস্কার নামক সংহার যজ্ঞে,—রুগ্ন অবসন্ন সমাজ শরীরে এই নির্ম্মম হাতুড়ের চিকিৎসায়,—এই বিজাতীয় বিষাগ্নি প্রয়োগে—তোমাদের উৎপাদ্য যে অভিন্নতা, যে একতা, সে কিন্তু সেই কাল-গর্ভা 'অভিন্নতা'—'একতা',—একথা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে !!

শেষ, সর্ব্বাময়হর সিদ্ধ সাধুবৈদ্যের নির্দ্দেশ মত, যথার্থ একতার,—অখিল-লোক-মোহন মহান্ বিশ্বপ্রেমের—যে মূল-সূত্র, যে মূলমন্ত্র, সেই ভুবন মঙ্গল মহাবাক্যই মাত্র ইঙ্গিত রূপে উল্লেখ করে আজ আমরা এই প্রসঙ্গ সাঙ্গ করবো ; ঐ শুন সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাণী ;—

"মাং হি পার্থ, ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃপাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোক মিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥

(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ৯।৩২,৩৩।)

অতীত ও বর্ত্তমানে বৈষম্য।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সকলেই এক এক জন ধর্ম্ম প্রচারক সাজিয়া নানা ভঙ্গিতে জনসমাজে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থাকে যে ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়াছি কি না, সে বিষয় আদৌ বিবেচনা করিয়া দেখিবার চেষ্টাও অনেকে করি না। যাঁহারা বুঝিয়াছিলেন তাঁহারা সেই বোঝার ভাবটী সর্ব্ব-সাধারণকে বুঝাইবার জন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া কেহ সংস্কৃত গ্রন্থাকারে, কেহ সুমধুর পয়ার ছন্দে, কেহ বা সহজ সরল সাধারণ বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এমনই দুর্ভাগা আমরা যে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখি না। যদিও কেহ কেহ আলোচনা করি, তাহাও আবার নিজ নিজ সুবিধামত ব্যাখ্যা করিয়া মূল উদ্দেশ্য হইতে অনেক তফাতে চলিয়া যাই। সেই কারণেই আজ এমন সুনির্ম্মল গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা মত, নানা শাখা, উপশাখার বিস্তার দেখিতে পাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট লীলাকালে এবং তৎপরেও কিছুদিন বেশ চলিয়াছিল, কিন্তু কালপ্রভাবেই হউক অথবা আমাদের দুর্দ্দৈববশতঃই হউক কেমন যেন এক বৈদেশিক বিষময় বিপরীত ভাবের বন্যা আসিয়া তাহার আপাত মধুর বাহিক চাকচিক্য দেখাইয়া আমাদিগকে সব ভুলাইয়া দিল। প্রভুর লীলাবসানের পর তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণ ঠিক ঠিক বিশুদ্ধ মত প্রচারের দ্বারা প্রভুর সেই ধারাকে বজায় রাখিতে যত্নের

ত্রুটী করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের প্রকটকাল মধ্যেই কিছু কিছু গল ধর্ম্মের নামে জনসমাজে প্রচারিত হইতে থাকে। কি ভাবে এরূপ হইল তাহারই কিঞ্চিৎ এখানে বলিব।

প্রথমতঃ ভ্রমবশতঃই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক হয়ত কেহ একটা ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিয়া ফেলিল। কিন্তু জিদের বশবর্ত্তী হইয়া সেই বিগর্হিত কার্য্যটীকেই বজায় রাখিয়া নিজ মতের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য কেউ গোপনে কেউ বা প্রকাশ্যে উহার প্রচার আরম্ভ করিল। এইভাবে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধ দুই চার জনের প্রচারে দ্বারা সরল হৃদয় জনসাধারণ উহাকেই সত্য বলিয়া আশ্রয় করিল। ইহাদের বাহ্যিক আচার ব্যবহার দেখিয়া প্রথমতঃ আদৌ বুঝিবার উপায় ছিল না যে, ইহারা "বিষকুম্ভ পয়োমুখ।" বাহিরে লোক দেখান ভাব ইহাদের এক রকম এবং অন্তরের ভাব অন্য রূপ। ক্রমে এই সকল লোকই নিজ নিজ দলপুষ্টির জন্য নানা ভাবে নিজেদের ভ্রান্ত মত প্রচারে লাগিয়া গেল। এইভাবে অসত্যের প্রচার, ভ্রষ্টাচারী প্রচারকগণের চেষ্টায় এতদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল যে, বর্ত্তমান সময় যথার্থ সত্যপথাবলম্বী খাঁটি লোক খুঁজিয়া বাহির করা এক প্রকার অসম্ভব।

এ দিকে তো এই ভাব, তারপর দিনের পর দিন যতই যাইতে লাগিল একটীর পর একটী প্রবল শক্তি তাহার নিজের শক্তিকে নানা ভাঙ্গতে খেলাইয়া সমাজের অনিষ্টই করিতে লাগিল। আজ যেখানে আসিয়া আমরা পৌঁছিয়াছি বিচার করিয়া দেখিলে এখান হইতে আমাদের আদর্শের আলয় বহুদূরে।

কোন মহাপুরুষ প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন "বর্ত্তমানের এই ভাব দেখিয়া বলিতে বাধ্য যে, সোণার ভারত বৈদেশিক প্রভাবের প্রবল বন্যায় বিদ্ধস্ত হইয়া সমাজ ও ধর্ম্মের আদর্শ বহুল পরিমাণে হারাইয়াছে।"

মহাপুরুষের কথা ধীরভাবে চিন্তা করিলে আমরা এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না। কেন না একটু চিন্তা করিলেই সহজে বুঝা যায় যে, ভারতের জাতীয় সভ্যতার বৈশিষ্টই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই এত অত্যাচার, এত অনাচার এত বিভীষিকা সহ্য করিয়াও সমাজ আজও দাঁড়াইয়া আছে। তুমি আমি হয়তঃ দু'চার পাতা পাঠ মুখস্ত করিয়া তোতা পাখীর শিখান বুলির মত উহার উদ্‌গার তুলিয়া প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলিতে পারি বা লিখিতে পারি। কিন্তু একটু ধীরভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি যে, আমার দেশের ঋষিগণ যে সকল শাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে কি শিক্ষা দেয়? গোঁড়ামি ছাড়িয়া বিচার করিয়া ভাবিয়া দেখ "ভারতের দর্শন শিক্ষাদেয় ত্যাগ," "ভারতের ধর্ম্ম অপকটে সাম্য ও মৈত্রী শিক্ষাদেয়।"

একজনকে বঞ্চিত করিয়া নিজকে পুষ্ট করিবার বাসনা ভারতের কখনই কাম্য নয়। আমার মনে হয় মহাপুরুষ ঠিকই বলিয়াছেন—"ভারতের ধর্ম্মের এই বৈশিষ্টতাকে আমরা সেইদিনই বিসর্জ্জন দিয়াছি যেদিন আমরা স্বাধীনতা হারাইয়া পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছি।"

বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন তাহার কিসে হিত হইবে তাহা বুঝিতে পারে না, সেইরূপ নিজের ঘরের অমূল্য সম্পদ ছাড়িয়া আজ স্বেচ্ছাচারীর দল যে সংস্কারের নাম করিয়া ছুটিয়াছে মোহবশে সেও বুঝিতেছে না যে, তাহা যথার্থ সংস্কার নয় উহা ধ্বংশেরই নামান্তর। এরূপ ভাব, এরূপ শিক্ষা এরূপ চিন্তার ধারা কখনই রক্ষণ শক্তির পরিপোষণ রূপে গঠন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে নাই—পারিবে না। কারণ এ ভাবের পশ্চাতে প্রবৃত্তির ভীষণ জ্বালা রহিয়াছে। নিবৃত্তির সুকোমল শীতল স্পর্শ না পাইলে সে জ্বালা কিছুতেই জুড়াইবে না। ইহা ধ্রুবসত্য যে, এরূপ স্বেচ্ছাচারের পতন অনিবার্য্য।

এখনও সময় আছে, যদি দিন থাকিতে সাবধান না হও নিশ্চয় জানিয়া রাখ এই প্রবৃত্তির আগুনই ধিকি ধিকি জ্বলিয়া তোমাদিগকে পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিবে এবং সেই ভস্মরাশি কালের বাতাসে উড়িয়া জগতের প্রতি দ্বারে দ্বারে গিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিবে যে, হিন্দু-সন্তানের স্বেচ্ছাচারিতার পরিণাম ফল এই। এখন না বুঝিলেও তখন বুঝিবে যে, তোমরা শিক্ষার নামে কি পরিমাণ বিষ গ্রহণ করিয়া ভ্রান্তপথে ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়া নিজেরাই নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছ।

তাই পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, শেষের কথা ভাবিয়া দিন থাকিতে সাবধান হও। আজ প্রাচীন মত, প্রাচীন প্রথাকে ভ্রান্ত—কুসংস্কার বলিয়া ছাটিয়া না ফেলিয়া বেশ ধীরভাবে ভাবিয়া দেখ, সেই মত, সেই পথ, সেই আচার, সেই ব্যবহারই তোমার অবশ্য গ্রহণীয়। তোমার দেহের অণুপরমাণুতে এই প্রাচীনের ভাবই মিশিয়া রহিয়াছে। নবীনের আপাত মধুর মনমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যের মোহে প্রাচীনের মাধুর্য্য হারাইও না, তাহাতে তোমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ই নষ্ট হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া তুমি আর লোক হাসাইও না, আগে তাঁহার সুনির্ম্মল চরিত্র—মঙ্গল আদর্শ—সুচিন্তনীয় উপদেশ—সর্ব্বোপরি তাঁহার অতুলনীয় অভাবনীয়—আচারকে জানিতে—বুঝিতে চেষ্টা কর, নিজে আগে প্রস্তুত হও—আদর্শ হও, লোকে আগ্রহ করিয়া তোমার চরিত্র অনুকরণে ধন্য হইবে। মনে রাখিবে "আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।" আজ একটু আভাস দিয়া রাখিলাম, আবশ্যক হইলে আরও কিছু বলিব।

শিক্ষিতের পরিচয় কি ?

শিক্ষিত লোকের পরিচয় জানিবার উপায় সম্বন্ধে বিচক্ষণ শিক্ষক 'জর্জ্জ কো' এক গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচনান্তে কয়েকটি বিধির নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জর্জ্জ কো নর্থওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ আচার্য্য; অধ্যাপনাতেই সুদীর্ঘকাল যাপন করিয়া সম্প্রতি তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার মতামতের বিশেষ মূল্য আছে। তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ পরম আগ্রহে সে প্রদেশে গৃহীত হয়। সাধারণভাবে তিনি শিক্ষার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন তাহা এস্থলে সঙ্কলিত হইল। আচার্য্য কোর মতে—

১। আচারে ব্যবহারে চিত্তবৃত্তি সমূহের নিখুঁত চালনায় যিনি সুদক্ষ; তৎপরতা, ভ্রমাপবাদ শূন্যতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে যিনি ভূষিত, তিনিই শিক্ষিত। ভাষার সুব্যবহারে তাঁহার কোথায়ও কুণ্ঠা থাকিবে না।

২। পরের সাহায্য ব্যতিরেকে যাঁহার চিন্তা ও অনুশীলনের শক্তি আছে,—এবং এ শক্তি অব্যাহত হওয়া চাই—তিনিই শিক্ষিত। শিক্ষিত ব্যক্তি স্বাধীন ও চিন্তাশীল হইবেন, পরের মতামত নকল করিবেন না।

৩। নিসর্গের সহিত শিক্ষিত ব্যক্তির পরিচয় সম্যক জ্ঞান থাকা চাই। মনুষ্য জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ কিসে? এ জ্ঞান

যাঁহার আয়ত্তাধীন এবং সেই জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া যিনি জীবন যাপন করেন, তিনিই শিক্ষিত।

৪। সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ইতিহাসে শিক্ষিত ব্যক্তির সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। মানবের শক্তিতে জগতে যত সব মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে মানবের পক্ষে নিজের শক্তি উপলব্ধি করা অসম্ভব। কাজেই নিজের শক্তি সম্বন্ধে দ্বিধা কোন দিন কাটিতে চায় না।

৫। রসজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যানুভূতি—এতদুভয়ের সহিত শিক্ষিত ব্যক্তির সম্যক পরিচয় থাকিবে। নিসর্গতার বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্য সাহিত্য সঙ্গীত বা অপর ললিতকলায় তিনি আনন্দ পাইবেন—তুচ্ছ অসার আনন্দে তাঁহার আদৌ প্রবৃত্তি হইবে না।

৬। শিক্ষিত ব্যক্তির সাধারণ (culture) জ্ঞানের উপর বিশেষ একটা এবং কোন বিষয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকা চাই। একটা বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর প্রসারলাভ থাকিবেই—এ কথা যেন খেয়াল থাকে।

৮। আত্মজন এবং সাধারণ নর নারীর প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তি কোন বিদ্বেষ বা কোন বৈরভাব পোষণ করিবেন না। সকলের সঙ্গেই আচারে ব্যবহারে ভদ্রতা, সম্ভ্রম সহযোগিতা এবং প্রীতি রাখিতে হইবে।

৯। সমাজের হিতকর যে সব সভাসমিতি বা সঙ্ঘ পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্ততঃ তার একটির সহিতও শিক্ষিত ব্যক্তির আন্তরিক যোগ থাকা চাই। ইহাতে সামাজিকতা ঘটে—অসামাজিকতা শিক্ষার সঙ্গে খাপ খায় না। এই সামাজিকতা শিক্ষার সহিত

শিক্ষিত ব্যক্তির চিত্ত নিজের গৃহসংসার ও আত্মীয় বন্ধু, নিজের মাতৃভুমি ও ধর্ম্মের প্রতি সম্যক অনুরাগ থাকিবে।

১০। জীবনের উদ্দেশ্য গভীর, একথা স্মরণ করিয়া ভগবানে বিশ্বাস ও নির্ভরতা রক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে উচিত। ভগবানে যার বিশ্বাস নাই, তার শিক্ষাকে শিক্ষানামে অভিহিত করা চলে না। ভগবানে বিশ্বাস এবং তাঁহাকে ভক্তি-পূজা নিবেদন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

কো-সাহেবের এই বিধির অনুমোদন করিয়া Scribner's Magaxine পত্রে সুলেখক মিষ্টার এভি বলিতেছেন—নিজেকে এখন কয়টী প্রশ্ন করিয়া দ্যাখো—সদুত্তর মিলে কি না। যদি মিলে তাহা হইলে বুঝিবে, তুমি শিক্ষাভূষণে ভূষিত হইয়াছ। (পঞ্চায়েৎ।)

সহভোজন বা ভোজনসঙ্কর

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।)

ভোজনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য পুষ্টি ও তৃপ্তি এবং পারমার্থিক লক্ষ্য সত্ত্বশুদ্ধি। কারণ সত্ত্বময় মনটী অন্নময় অর্থাৎ অন্নে গঠিত। শ্রুতি বলেন —অন্নময়ং হি সৌম্যমনঃ” ছান্দোগ্য ৬।৫।৪, তাহা হইলে মানবের সর্ব্বস্ব মনের সহিত ভোজনের যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির নির্দ্দেশ,—“আহারশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ” ৭।২৬।২ এস্থলে আহার শব্দে আচার্য্যপাদ শঙ্কর “আহ্রিয়তে ভোক্তুর্ভোগায়” এইরূপ লিখিয়া ভোগ্য যাবতীয় বিষয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীব

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপাদি যে সকল বিষয় গ্রহণ করে, উহাদের সকলেরই বিশুদ্ধি অন্তঃকরণের পবিত্রতার নিদান। অবশ্য এ প্রবন্ধে ভোজ্য ও পানীয় আমাদের মুখ্য আলোচ্য। হিন্দুজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য আত্ম-দর্শন বা মুক্তি। প্রাক্তন কর্ম্মফলে উপস্থাপিত যেরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে এবং যেরূপ কর্ম্মেই আমরা ব্যাপৃত থাকি না, সকলের চরম উদ্দেশ্য আত্মোন্নতিমূলক মুক্তি। এই আর্য্য সিদ্ধান্তে যাঁহারা সন্দিহান বা আস্থাহীন এ প্রবন্ধ তাঁহাদের জন্য লিখিত হইতেছে না। প্রাণধারণের মুখ্য উপায় যেমন নিয়মিত ও বিশুদ্ধ আহার্য্যগ্রহণ, তেমনি উহার প্রধান লক্ষ্য মোক্ষ। আর্য্যশাস্ত্রে হিন্দুজীবনের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যগুলি সময় বিভাগ মতে (according to the routine) ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। উহাতে (আহ্নিকতত্ত্বে) ভোজন ক্রিয়াটী পঞ্চম যামার্দ্ধ কৃত্য। সুতরাং আস্তিক মানবের ভোজন কার্য্যটি অনিয়মিতকালে পানভোজী ইতর জন্তুর ন্যায় যাহা তাহা, যখন তখন এবং যেখানে সেখানে সম্পাদনীয় নহে। ভোজন পান, রতি ও নিদ্রার বাসনা জীবমাত্রেরই প্রবৃত্তিমূলক দেহধর্ম্ম। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজীব মানব যদি এই পশুসুলভ প্রবৃত্তির ক্রীতদাসত্বকেই দুর্লভ মানবজীবনের সার মনে করে, তাহা হইলে উহাকে ভাগ্যবিড়ম্বিত ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? ফলতঃ আহারের জন্য মানব সৃষ্ট হয় নাই, মানবের জন্যই আহার সৃষ্ট হইয়াছে; ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। শ্রুতি স্মৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈদ্যকশাস্ত্রে পর্য্যন্ত আহার সংক্রান্ত এত বিধিনিষেধ দৃষ্ট হয় যে, ঐগুলির অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়াও এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন অন্নময় বলিয়া উহার শুদ্ধির জন্য আহার শুদ্ধির একান্ত আবশ্যক। লৌকিক দৃষ্টিতে দেখিলেও স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, আহারের সহিত স্বাস্থ্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ভগবান মনুর উপদেশ, "অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্য-

ক্ষাতিভোজনম্।" অতিভোজন স্বাস্থ্যনাশক, আয়ুক্ষয়কারক, স্বর্গ অর্থাৎ পারলৌকিক কল্যাণলাভের প্রতিবন্ধক। এস্থলে ভোজনের আতিশয্যটি কেবল পরিমাণগত নহে, প্রকৃতিগতও বুঝিতে হইবে। এই কথাই ভারতের অমরকবি কালিদাস 'কুমার সম্ভবে' প্রকারান্তরে বুঝাইয়াছেন শরীরমাদ্যংখলু ধর্ম্মসাধনম্", শরীররক্ষা ধর্ম্মসাধনের প্রথম ও প্রধান উপায়। ইহাতে বুঝা গেল, বিহিত আহার গ্রহণ স্বাস্থ্যের মূল নিদান। শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল থাকিলেই হিন্দু জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ধর্ম্ম আচরণে সুযোগ ঘটিকা থাকে। এজন্য আর্য্যশাস্ত্রে আমরা ভোজনের স্থান, কাল, পাত্র, সংসর্গ ও দ্রব্যের বৈধাবৈধ বিষয়ে বহুল পর্য্যালোচনা দেখিতে পাই, স্থান সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"সায়ং প্রাতর্ম্মনুষ্যাণামশনং শ্রুতিবোধিতম্।
নান্তরা ভোজনং কুর্য্যাদগ্নিহোত্রসমো বিধিঃ॥"

বেদে পূর্ব্বাহ্নে ও সায়াহ্নে মানবের ভোজন বিহিত হইয়াছে। ঐ দুই কালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ভোজন নিষিদ্ধ। কারণ ভোজনের বিধি অগ্নিহোত্র যজ্ঞের বিধির সমান। ভোজনকালে ভোজ্যদ্রব্যে দৃষ্টিদোষ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। শাস্ত্র বলেন—নিকৃষ্ট, দীন, বুভুক্ষু, পতিত, পাষণ্ড, পাপরোগী, চণ্ডাল, কুনখী, ব্রহ্মঘাতী, সূতিকা, রজঃস্বলা, কুক্কুর, কুক্কুটদৃষ্ট, কেশযুক্ত, কীটাকুলিত, মৃত্তিকাযুক্ত, বিদূষিত, সন্দেহপূর্ণ, পর্য্যুসিত (বাসি) অন্ন ভোজন করিবে না। এই প্রমাণে প্রসূতি ও রজঃস্বলাপৃষ্ট অন্ন বর্জ্জনের স্পষ্ট বিধান আছে। অন্ত্যজাতিস্পৃষ্ট জল ও অন্নের বর্জ্জনকে যাহারা ঘৃণার কার্য্য বলেন, এ কথাগুলি তাঁহাদের বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। শাস্ত্রে ইহার প্রতিপ্রসবও দৃষ্ট হয়। যথা,—

"অন্নং ব্রহ্ম রসো বিষ্ণুর্ভোক্তা দেবো মহেশ্বর।
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভুঞ্জানো দৃষ্টি দোষঃ ন বিদ্যতে॥"

অর্থাৎ যিনি, অন্ন ব্রহ্মের প্রতীক, জল নারায়ারণ ভোক্তা (ভোজনকর্ত্তা) পরমাত্মা—এইরূপ বুদ্ধিতে ভোজন করিতে পারেন; তাহার সম্বন্ধে দৃষ্টিদোষ কার্য্যকর হয় না। বলা বাহুল্য যে, অদ্যাপি ভোজনকালে ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টি অনিষ্টকর বোধে বর্জ্জনের চেষ্টা সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। শাস্ত্রে ভোজন, মলমূত্র ত্যাগ, বিহার ও যোগাভ্যাস এগুলি "আহারং বিজনে কুর্য্যাৎ' ইত্যাদি প্রমাণে প্রকাশ্যে করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহার যাঁহারা বৈজ্ঞানিক যুক্তির দাবী করিবেন, তাঁহারা অবশ্য পাশব বিহারের পক্ষপাতী। ভোজনকালে ভার্য্যার সহিত কথোপ-কথনও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ! কারণ, ভোজনে মৌনাবলম্বন পরিপাকক্রিয়ার সহায়ক। ভোজনে সংসর্গদোষ সবিশেষ বর্জ্জনীয়। সংসর্গ হইতে দোষগুণ জন্মে, ইহা এ দেশের সত্যগর্ভ সনাতন প্রবাদ। "সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ" এ ভাষা প্রবাদও আবাল্যশ্রুত। ইংরাজী কথা-সাহিত্যেও একটী সুশীল বালকের বাল্যে গৃহীত সুন্দর ছবি ও পরবর্ত্তী কালে দুশ্চরিত্র কারারুদ্ধ ঐ বালকেরই কুৎসিৎ চিত্র সংসর্গের প্রভাবের অপরিহার্য্যত্বের অকাট্য সাক্ষ্য দান করে। অগ্নির চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর সন্তাপ এবং জলাশয় সন্নিহিত বায়ুর শৈত্য ইহার জীবন্ত প্রমাণ। তাই অতি প্রাচীন শ্রুতিতেও পাপ সংসর্গকে পঞ্চ মহাপাতক বলা হইয়াছে।

'এতে পতন্তি চত্বারঃ পঞ্চমশ্চাচরং স্তৈরিতি।'

ছান্দোগ্য ৫।১০।৯।

ভোজন পানের সংসর্গ একান্ত ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। স্মৃতিকার মহর্ষি আঙ্গিরার বিধান; চণ্ডাল, শ্বপচ, ক্ষত্তা, সূত, বৈদেহক, মাগধ ও আয়োগব জাতীয়গণ অন্ত্যাবসায়ী। জ্ঞানপূর্ব্বক ইহাদের অন্ন ভোজন প্রায়শ্চিত্তজনক। লঘু ও গুরুভেদে সংসর্গ দ্বিবিধ। আলাপ, স্পর্শ ও

দর্শনাদি লঘু সংসর্গ। লঘু গুরু ভেদে সংসর্গজনিত দোষের ন্যূনাধিক্য ঘটে। যৌন সংসর্গ, পান, ভোজন, ও একত্র শয়নাদিতে পাপদুষ্ট রোগীর পাপ ও রোগ সংসর্গকর্ত্তায় সংক্রামিত হয়, ইহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ সংক্রামক ব্যাধি। শাস্ত্রে প্রাক্তন পাপই রোগে রূপান্তরিত হয় বলা হইয়াছে।

"পূর্ব্বজন্মকৃতং পাপং নরকস্য পরিক্ষয়ে।
বাধতে ব্যাধিরূপেন তস্য কৃচ্ছ্রাদিভিঃ শমঃ॥"

নব্য বঙ্গের অন্যতম স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের ও স্পষ্ট নির্দ্দেশ,—"Every thing is infectious on this earth good or bad."—"রাজযোগ।" নিত্যপাঠ্য সন্ধ্যা সূক্তে "যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম। অসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা।"—এইরূপে উচ্ছিষ্ট, অভোজ্য ভোজন, অসদাচরণ ও অসৎপ্রতিগ্রহজনিত পাপমোচনের প্রার্থনা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আচার্য্যপাদ শঙ্করের ন্যায় পূজ্যপাদ রামানুজ আচার্য্যও তাঁহার সুবিখ্যাত শ্রীভাষ্যে স্থান, কাল, প্রকৃতি ও আশ্রয় হেতু দূষিত ভোজ্যগুলির বর্জ্জন ভক্তি সাধনের প্রাথমিক অঙ্গ বলিয়াছেন। "কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ" প্রমাণে কলিতে যে পরাশরের স্মৃতির বিশেষ প্রামাণ্য দেওয়া হইয়াছে, উহাতেও "শুনা চণ্ডালদৃষ্টৌ বা ভোজনং পরিবর্জ্জয়েৎ"। ৬।৬৪। এরূপ স্পষ্ট বিধান আছে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতি প্রামাণ্য গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন।
মন দুষ্ট হইলে নহে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ॥"

এই কথাটি তৎকালীন শাস্ত্রজ্ঞ ভক্ত মহারাজ প্রতাপরূদ্রের মনের কথা। এখনও ভিক্ষা গ্রহণ কালে বহু সাধু বৈষ্ণব এ সদাচার পুরাপুরি

রক্ষা করেন। জ্ঞানগুরু মহর্ষি ব্যাসদেব প্রচ্ছন্ন পাপের অজ্ঞাতসারে সংক্রামকতা সম্পর্কে সতর্ক করিতেছেন; "স্বজনের সহিতও এক পংক্তিতে ভোজন করিবে না। কাহার দেহে কি পাপ প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা কে বলিতে পারে?" এরূপ স্থলে ভস্ম, স্তম্ভ, দ্বার অথবা জলের দ্বারা পঙক্তি ভেদ করিবে। এই শ্লোকস্থিত 'স্বজনৈরপি' পদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত। কারণ এরূপ পাপগ্রস্ত স্বজনের সহিত ভোজন না করিলে তাঁহাকে আন্তরিক ঘৃণা বা উপেক্ষা করা বুঝায় না। এ সকলের মূলনীতি আত্মরক্ষা। "আত্মানং সততং গোপায়ীত" এই মহীয়সী শ্রুতির উপদেশ সংক্রামক ব্যাধির মত অসৎ সংসর্গ বর্জ্জন মানবের প্রকৃতিনিষ্ঠ প্রবৃত্তি। ফলতঃ মানবধর্ম্ম সংহিতার প্রণেতা মহামান্য মনুর উপদিষ্ট "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এবচ।" ইত্যাদি মত আস্তিকপন্থী হিন্দু মাত্রেরই অবশ্য প্রতিপাল্য। যে সদাচারের মূলে এক্ষণে আমরা সাক্ষাৎ কোন শ্রুতি স্মৃতির বচন পাই না, যুগভেদে ঐ সকল বচন প্রচলিত ছিল বুঝিয়া ঐ লোকাচারগুলিও বেদ স্মৃতি বাক্যবৎ প্রামাণ্যবোধে গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। এ বিষয়ে মহামান্য সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদ ভাষ্যোপক্রমণিকায় উপদেশ দিয়াছেন, "বেদমূলায়াঃ স্মৃতেঃ তদুভয়মূলায়াঃ লোকপ্রসিদ্ধেশ্চ প্রামাণ্যং দুর্ব্বারম্।" কলিপাবন প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী তীব্রবৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ ভক্তবর শ্রীল সনাতনকে শিক্ষা ব্যপদেশে জগতের প্রতি উপদেশ দিয়াছেন,—

"মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ।

* * * *

মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই লোক নাশ॥"

চৈঃ, চঃ, অন্ত্য, ৬৯।

আমরা মাননীয় সনাতন পন্থীদিগকে শ্রুতি স্মৃতির সারভূত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই যুগোচিত উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিতে অনুরোধ করি। (বঙ্গবাসী)

হরিনাম গানের মাহাত্ম্য

উন্মাদ ব্যক্তির কাণ্ড—মাটী খুঁড়িয়া টাকা বাহির।

খড়গপুর হইতে জনৈক সংবাদদাতা জানাইয়াছেন :—

গোপালচন্দ্র জানা খড়গপুর থানা সম্মিলনীতে গ্রেপ্তার হইয়া বিচারার্থে প্রেরিত হইয়া হাজতে ছিল। হাজতে থাকা কালে তাঁহার একটু উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পাগলামির জন্য তাঁহাকে মেদিনীপুর জেলের সেলে আবদ্ধ রাখা হয়। তারপর সে একবারেই বদ্ধপাগল হইয়া যায়। জেলের মধ্যে ১০ দিন কিছুমাত্র আহার্য্য গ্রহণ করে নাই। সর্ব্বদা হরিনাম গানে মত্ত থাকিত। এই অবস্থা দর্শনে ৩০।১১।৩২ তারিখে বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ছাড়িয়া দেন। মুক্তির পর বাড়ীতে বিশেষ ভাবে চিকিৎসা করা সত্ত্বেও তাহার কোন প্রকার উন্নতি দেখা যাইতেছে না। সে সর্ব্বদাই হরিনাম গান করিতেছে। গত ৩।১২।৩২ তারিখে সে বলে যে, যদি হরিকে মহোৎসব দাও তাহা হইলে আমি আহার করিব। ইহাতে তাহার ভ্রাতারা বলে যে, টাকা কোথায় পাইব। তখন সে তুলসীমঞ্চের নিকট যায়, এবং নখ দিয়া মাটী খুঁড়িতে থাকে ও কয়েক মিনিট পরে ৫৲ টাকা বাহির করিয়া দেয়। গ্রামস্থ সকলে আশ্চর্য্য হইয়া সে স্থানের মাটী খুঁজিয়া দেখেন কিন্তু কিছু না পাইয়া

সকলে তাহাকে বলেন যে, উহাতে মহোৎসব হইতে পারে না। অন্ততঃ ৪০।৫০ টাকা চাই। সে তখন পুনশ্চ সেই স্থানে যাইয়া মাটী খুঁড়িতে থাকে এবং ৩২৲ টাকা বাহির করিয়া দেয়। তখন সেখানে অন্ততঃ ২৫।২৬ জন উপস্থিত ছিলেন। পরে সে স্থান হইতে আরও ৮৲ টাকা বাহির করে। এই টাকা দ্বারা ৫।১২।৩২ তারিখে সন্ধ্যায় চিড়া মহোৎসব দেওয়া হয়। পাঁচশত লোক ঐ মহোৎসবে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। সে ১৬ দিন হইল জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই; দিবা রাত্রি কেবল হরিনাম পানে মাতোয়ারা আছে। (পঞ্চায়েৎ)

প্রাপ্তগ্রন্থ—সমালোচনা

১। কীর্ত্তন-কলিকা।—শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণরায়, বি এ বিরচিত। ৪৮নং রামকমল ষ্ট্রীট্ খিদিরপুর কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ভবতারণ মিত্র বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৶০ ছয়আনা। গ্রন্থখানি আকারে বেশী বড় নয় কিন্তু বর্ণনীয় বিষয়ের গুরুত্বে খুবই মূল্যবান। মোটামুটি চারিটী বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ১। নিমাই সন্ন্যাস। ২। অনুরাগ। ৩। রাসলীলা। ৪। মাথুর। গ্রন্থকারের কবিতা লিখনের শক্তির পরিচয় আমরা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই পাইয়াছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "বিদেশিনী" ভণিতাযুক্ত কয়েকটী শ্রীকৃষ্ণলীলার পদ আমরা পাইয়াছিলাম। রচনার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতেই পারি নাই যে, ইহা আধুনিক কোন কবির লেখা। শুধু আমরা নয়, বহুস্থানে সেই সকল পদ-কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতাদের মুখে ঐভাবেরই কথা শুনিয়াছি। বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার খুব সতর্কতার সহিত কোনরূপ

ভাব-বিপর্য্যয় না ঘটাইয়া বক্তব্য বিষয় অতি সুন্দর ও সুমধুর কবিত্বে-বর্ণন করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে "বন্দনা"র মধ্যে একস্থানে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

"অজ্ঞ, মূর্খ, বদ্ধ, মোর কোন গুণ নাই।
শক্তি দেহ প্রেমানন্দে লীলাগুণ গাই॥"

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া মনে হয় গ্রন্থকারের এই প্রার্থনায় সত্যসত্যই তিনি শক্তি পাইয়াছেন এবং প্রেমানন্দে লীলাগুণ বর্ণন করিয়াছেন। তবে একটা কথা না বলিয়া পারিলাম না, সেটী গ্রন্থকারের কার্পণ্য দোষ! তিনি এইসকল লীলা এত সংক্ষেপে কেন বর্ণন করিলেন বুঝিলাম না। আমরা আশাকরি শীঘ্রই এই গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইবে, এবং সেইসময় ইহার কলেবর আরও বর্দ্ধিত হইবে। ছাপা, কাগজ কোনটিই মন্দ নহে। আমরা এই গ্রন্থখানি সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বহুগ্রাহক এবার ভিঃ পি ফেরৎ দেওয়ায় ভক্তিভাণ্ডার বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন সেকারণ এবং ছাপাখানার গোলমালে যথানিয়মে পত্রিকা প্রকাশ হইতেছেনা শীঘ্রই নূতন ব্যবস্থা হইবে। (কার্য্যাধ্যক্ষ)

১৩০৮ বঙ্গাব্দে
নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদরত্ন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

৩১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা
ফাল্গুন ১৩৩৯

সম্পাদক
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন।

বিনীত নিবেদন

বর্ত্তমানে দেশে দারুণ অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত। ছোট বড় সকলকেই কিছু না কিছু এজন্য ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। "ভক্তি" পত্রিকার গ্রাহকবর্গের মধ্যে অনেকেই এই কারণে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভক্তির মূল্য পাঠাইতে পারিতেছেন না ইহা আমরা বুঝিতেছি, তথাপি তাঁহাদের প্রদত্ত ভক্তির বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড়টী টাকাই যে, এই ভক্তি-প্রকাশেদ্বারা ধর্ম্ম-প্রচারের ও একটী প্রাচীন বৈষ্ণব পত্রিকার জীবন রক্ষার প্রধান সহায় তাহা আমরা ভুলিতে পারি নাই, তাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, এখনও যাঁহারা বার্ষিক মূল্য পাঠান নাই একটু চেষ্টা করিয়া এই সময় উহা পাঠাইয়া আমাদিগের কার্য্যের সহায়তা করুন। ডাক [illegible] অন্যান্য বারের ন্যায় প্রত্যেককে পৃথক পৃথক [illegible] পত্র পাঠাইতে পারিলাম না, সাধারণ ভাবে এই নিবেদন জানাইলাম। বিনীত—কার্য্যাধ্যক্ষ "ভক্তি"

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা
নগদ প্রতি খণ্ড ৵০ তিন আনা, ভিঃ পিতে ১৵০ আনা

ভক্তি-সম্পাদক—

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন সম্পাদিত

কীর্ত্তন-গীতি-সংগ্রহ (দ্বিতীয় সংস্করণ) নানাবিধ স্তব ও স্তোত্র সহিত	১॥০
প্রেমানন্দ সংবাদ (প্রশ্নোত্তর ছলে সুন্দর উপদেশ গ্রন্থ)	॥০
পঞ্চগীতা (প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সহ) নিত্য পাঠ্যগ্রন্থ	।৵০
প্রাণের কথা (সদুপদেশের ভাণ্ডার)	।০

প্রাপ্তিস্থান।—"ভক্তি-কার্য্যালয়" পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া। অথবা
"মহেশ লাইব্রেরী" ১৯৷২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সূচীপত্র

সম্পাদক কর্ত্তৃক মাসিলা "ভক্তি-নিকেতন" পোঃ আন্দুল-মৌড়ী হাওড়া হইতে প্রকাশিত
ও কলিকাতা ৭৭নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

৩১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা | ভক্তি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। | ফাল্গুন ১৩৩৯

ভারতী-চরণে নিবেদন

(শ্রীপাট দেনুড়ে শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভুর
শুভ আবির্ভাব-স্মৃতিসভায় পঠিত।)

(১)

বিশ্বের হিতব্রতের কামনা জেগেছিল তব মনে,
ভেবেছিলে তুমি,—উদ্ধার হবে কিসে পাপী-তাপীগণে,
সেই চিন্তার দাহনে দহিয়া,
নাহি সুখ পেলে গৃহেতে রহিয়া,
তাই একদিন গেলে বাহিরিয়া গৃহ সংসার ছাড়ি ;
মহাসত্যের সন্ধানে দিলে সাধনা-সাগরে পাড়ি।

(২)

তুচ্ছ সুখ ল'য়ে ক্ষুদ্র গৃহকোণে মন বসিল না ব'লে,
তাই ঘর ছেড়ে তেমন করিয়া তুমি গিয়াছিলে চ'লে ;
গৃহ-হারা হ'য়ে সন্ন্যাসি বেশে,
ঘুরে এলে তুমি কত দেশে দেশে,
কি মনে করিয়া কি ভাবিয়া শেষে তুমি কাটোয়ায় আসি,—
স্থাপিয়া আশ্রম বসিলে হরষে তুমি ওগো সন্ন্যাসি !

(৩)

কতই যেন কি আশা-আশ্বাসে হ'য়েছিল তব হর্ষ,
সেই আশা ল'য়ে কাটোয়ায় তুমি কাটাইলে ক'টী বর্ষ ;
পূত ভাগীরথী লহর তুলিয়া,
নাচিত হরষে দুলিয়া দুলিয়া,
কল কল স্বনে গেয়ে যেত গান তব আশ্রম-পাশে ;
একা ব'সে সেথা দিবস গণিতে তুমি যেন কা'র আশে !

(৪)

কতই আশায় ভরিয়া বক্ষঃ কাহার প্রতীক্ষায়,—
তুমি যে সেথায় ছিলে গো, তখন কেবা জেনেছিল হায় !
সেথায় বসিয়া কতই ভাবিতে,
কখনো হাসিতে কখনো কাঁদিতে,
আশা-নিরাশায় ব্যাকুল হইতে,—কি ঝড় বহিত মনে !
কেহ জানিত না,—একা ব'সে তুমি ভাবিতে গো নিরজনে।

(৫)

করুণা-কোমল দুটী নয়নের অবিরল ধারা ঝরি,
ভাসিত তোমার বিশাল বক্ষঃ ব্যথিতের ব্যথা স্মরি ;
এই বিশ্বের ব্যথা ঘুচা'বার,
যাহার উপরে দিবে তুমি ভার,
যেই দিন দেখা পেলে ওগো তার,—সেই দিন পেলে শান্তি ;
সন্ন্যাসি বেশে হেরিলে যেদিন নিমাইএর নবকান্তি !

(৬)

জীবন তোমার ধন্য হইল, সার্থক হ'ল প্রাণ ;
সেইদিন ওগো,—যেদিন পাইলে শিষ্যরূপে ভগবান !

পতিতোদ্ধার মন্ত্র প্রদানে,
দীক্ষা দিলে গো তুমি ভগবানে,
বিশ্বের গুরু হ'লে সেইদিনে, করিলে বিশ্ব ধন্য ;
বিশ্বহিতব্রতী বলিয়া হইলে সেইদিন হ'তে গণ্য !

(৭)

ওগো ও ভারতি ! আজিকে তোমার মহিয়ান্ মহিমায়,
উজ্জল হ'য়েছে সারাটী বিশ্ব নাহি সন্দেহ তায় ,
ধর্ম্মজগতে আজিকে তোমার,
নাহিক তুলনা, নাহি—নাহি আর,
অতুল্য ধন তুমি এ ধরার,—ভকতি প্রেমের খনি ;
মুক্তি-প্রয়াসী মানব জাতির শাশ্বত শিরোমণি !

(৮)

কিন্তু ভারতি গো ! আজিকে তোমার আবির্ভাব-দিনে তাই,
কাতর অন্তরে তোমার চরণে এটুকু জানা'তে চাই ;—
প্রথমেই তব আবির্ভাব যেথা,
তব সে বাল্যভবন এই হেথা,—
এই দেহুড়ের ব্রহ্মচারী বাড়ী ;—সে কথা রাখিও মনে ;
কত গড়াগড়ি দিয়ে গেছ ওগো, এ ভবন-প্রাঙ্গনে !

(৯)

আজি এই তব বাল্যাশ্রমে তব আবির্ভাব-স্মৃতি,
জাগিয়া উঠিয়া,—মোদের পরানে উথলে পুলক প্রীতি ;
আসি তাই ওগো বরষে বরষে,
তোমারি এ স্মৃতি পূজিতে হরষে,
করিবারে তব চরণ সকাশে ভকতির নিবেদন ;
ওগো ও ভারতি! বিশ্বের গুরু ! মোদের পরাণধন !

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ম্মফলবাদ খণ্ডন

(শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি, এল)

মহারাজা অশোকের সময় প্রমার, পুরীহর, চালুক্য বা শোলাঙ্কী ও চৌহান—এই চারি দল ক্ষত্রিয় বীর বৌদ্ধ দলন করেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধের নীতিশিক্ষা, পূজাপদ্ধতি বাংলার ও উৎকলের বহু স্থানে অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ আছে। ব্রাহ্মণেরা ঐ চতুঃপ্রবাহিনী সৃজন করিয়া দেশ হইতে বৌদ্ধ নির্ব্বাসন করেন, কিন্তু বৌদ্ধমত খণ্ডনার্থ যে সকল শাস্ত্র প্রচারিত হয় সেগুলিকে সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের শেষ চিহ্ন স্বরূপ এখনও স্থানে স্থানে ধর্ম্মের মঠাদি বর্ত্তমান আছে। জাতিভেদের নিরর্থকতা দেখাইতে এখনও উৎকলের মহাপ্রসাদ বর্ত্তমান। আর নিরীশ্বরবাদের প্রধান চিহ্ন কর্ম্মফলবাদ ও দুঃখবাদ অদ্যাপি ওতঃপ্রোতভাবে আমাদের বহু গ্রন্থে পুস্তকে উপন্যাসে এবং অচিন্তাশীল জনসাধারণের কথালাপে আপনাদের অস্তিত্ব অটুট রাখিয়াছে।

আজ আমরা এই কর্ম্মফল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পরে দুঃখবাদ সম্বন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল। পরন্তু এই দুইটিবাদ এত প্রবল-ভাবে আমাদের দেশকে অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে যে, প্রকৃত কথা বলিতেও ভয় করে। আশা করি 'ভক্তি'র ভক্ত পাঠকগণ মাদৃশ বাক্-সংযমবিহীন মন্দধীকে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

এ প্রবন্ধ আমি লিখিতাম না। কিন্তু দেশের অত্যধিকাংশ লোক

এই দুইটি নিরীশ্বরবাদকে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত সেশ্বর সনাতন নীতি মনে করিয়া সাতিশয় নিপীড়িত হইতেছেন—ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া প্রাণে মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাই। সেই ব্যথা—নিজের ও তাঁহাদের—উপশমের জন্যই এই উন্মত্ত প্রয়াস। ইহা পাঠে যদি কাহারো চিত্তে আমাদের সেই আনন্দময়—প্রেমময়—নবকিশোর নটবর—বেণুকর ঠাকুরের নিখিল রসামৃত ধারায় হৃদয় চিরানন্দিত হয়,—তবেই শিক্ষা, দীক্ষা ও লেখা সফল জ্ঞান করিব।

এবার আমরা 'কর্ম্ম' জিনিসটাকে পরীক্ষা করিব। দেখুন,—কর্ম্ম বলিলেই একজন 'কর্ত্তা'র আবশ্যক। আমারি যদি কর্ম্ম বলি, তাহা হইলে আমিই তাহার 'কর্ত্তা' হই। কিন্তু সর্ব্বোপনিষদ ধেনুর ক্ষীরধারাবৎ শ্রীগীতা বলেন—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতিমন্যতে॥"
সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় প্রকৃতির গুণে।
অহমভিমানে জীব নিজ কর্ম্ম মানে॥

আত্মা কাচ সদৃশ। ইহাতে কোন দাগই লাগে না। শ্রীগীতা বলেন—অদাহ্যোঽয়ং ইত্যাদি—ইহা অদাহ্য ইত্যাদি। ঠিক যেন আকাশ—সদাই শুদ্ধ—অশুদ্ধ হইতে জানে না।

কিন্তু হীরক কাচকেও অঙ্কিত করে। আমাদের জীবাত্মাটিও অহমভিমান রূপ হীরকের তীক্ষ্ণতায় অঙ্কিত হয়। 'কে আমি'—এ জ্ঞান যার পরিস্ফুট হয় নি, তারই অহমভিমান আসে (১৩২৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের 'ভক্তি'তে 'আমি কে ?' প্রবন্ধ আছে) এই অভিমানবশেই জীব নিজকে কর্ত্তা সাজাইয়া লয়। কর্ত্তা সাজিলেই 'কর্ম্ম' সৃষ্টি হইতে থাকে।

তখন আর যাবে কোথা ?

"আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াঃ।
তে পচ্যন্তে নরক নিগূঢ়াঃ॥"
মূঢ় যেই জন, আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে।
কিনা কষ্ট পায়? পচি' ভীষণ নরকে॥

আত্মজ্ঞান কিসে হয়? না,—

"কামং ক্রোধং লোভং মোহং।
ত্যক্ত্বাজ্ঞানং পশ্য হি কোঽহং॥"
কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি' পরিহার।
'কে আমি' বুঝ না জীব করি' সুবিচার॥

ভগবান শঙ্করাচার্য্য মোহমুদ্গর রচনা করিয়া জীবকে আত্মজ্ঞান দিবার আশা করিয়াছিলেন। তারি প্রথমাংশ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকাংশদ্বয়।

শেষাংশ দেখুন—

"ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ।
ব্যর্থং কুপ্যসি ময্য সহিষ্ণুঃ॥"
তোমাতে আমাতে অন্যে একমাত্র বিষ্ণু।
বৃথা কোপ কর মোরে ওহে অসহিষ্ণু!॥

ইনি ক্ষুদ্র আমি'র ভিতর ব্যাপক বিষ্ণুর সন্ধান দিলেন। কাজেই সোঽহংবাদ প্রচার হইল। কিন্তু শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদ যখন মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করেন—'কে আমি?' মহাপ্রভু শিখাইলেন,—'জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস'।

শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পরিঃ—জীবত্ব ও বিষ্ণুত্ব পৃথক্ রহিল। জীব 'দাসোঽহং' হইল। সুতরাং কর্ত্তৃত্ব আর হয় কিরূপে? কর্ম্মই বা সৃষ্ট করে কে? দাসের কর্ম্ম কর্ম্ম নয় তাহা মনিবের সম্বন্ধে কর্ম্ম কিন্তু দাসের সম্বন্ধে সেবা—দাস্য।

দাস অভিমান না আসা পর্য্যন্তই জীবের 'কর্ত্তাহং' অভিমান থাকে। সুতরাং 'কর্ম্ম' হয়। কর্ম্ম হইলেই তার একজন ফলভোক্তা চাই। নিরীশ্বর মতে জীব ছাড়া অন্য কেউ নাই কাজেই জীবই তার ফলভোগী।

পরন্তু এই নিরীশ্বর 'আমি কর্ত্তা' 'আমি কর্ম্মফলের ভাগীদার'—এই ভ্রান্ত ধারণাবশে জীব বহু মনোবেদনা সহ্য করে।

একজনের তেতলা বাড়ী দেখিল, নিজের পর্ণকুটীর। মনে মনে বলিল, ওর কর্ম্ম ভাল—আমার কর্ম্ম খারাপ, তাইত আমার এই পাতার কুঁড়ে।

আর রক্ষা নাই। অমনি প্রাণে প্রাণে দুঃসহ কষ্ট, যন্ত্রণা, জ্বালা, ব্যথা তাহাকে পচাইতে লাগিল। আর সে, আনন্দময়—প্রেমময় ভগবানকে ধরিয়া আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারে না।

কিন্তু যদি তার কর্ত্তাহহং অভিমান না আসিত, দাস অভিমান হইত, তাহা হইলে সে আর নিজ কর্ম্ম মন্দ ভাবিয়া ঐরূপ মর্ম্মব্যথা সহ্য করিত না।

দাসের সেবা-সুখ মাত্র, তাতে দুঃখের লেশ মাত্রও নাই। যতক্ষণ দুঃখ বুদ্ধি থাকবে ততক্ষণ বুঝ্‌তে হবে সেবা-বুদ্ধি প্রকৃত হয় নি। আত্মসুখ প্রত্যাশা আছে। সেটা কাম। প্রেম নয়, ভক্তি নয়। দাস্য—প্রেম—ভক্তি।

যার দাস-অভিমান আসে—সে ঐরূপ পাতার কুঁড়েতে থেকে কি ভাব্‌বে—কি কোরে আনন্দিত হবে? এখন এইটেই দেখা যাক্‌।

সাধন ভজন যাঁর যতদূর তিনি তদনুরূপ উত্তরই পাবেন! মাদৃশ সাধন ভজন শূন্য বাচালের মনোবৃত্তি এইখানে লিখিব—ভক্ত সুধীগণ নিজগুণে কৃপা করিবেন!

ভক্ত দাস, পাতার কুটীরে থেকে, মোটা অন্ন খেয়ে, মোটা কাপড়

পোরে'—ভাব্‌বে, সর্ব্বাগ্রে, যে-'আমার প্রভুর যাতে সুখ আমারও তাতেই সুখ'। তারপর ভাব্‌বে শ্রীরামচন্দ্রের কথা—পঞ্চপাণ্ডবের কথা হরিশ্চন্দ্রের কথা ইত্যাদি।

শ্রীরামচন্দ্র রাজার ছেলে হোয়েও যদি বনে পাতার ঘরে থাক্‌তে পারেন—মা জানকী বসনাভাবে গাছের ছাল পোরে লজ্জা নিবারণ কোরতে পারেন, তা হোলে আমার আর কি এমন কষ্টটা? আমি ত লোকালয়ে আছি। কাপড়ও পর্‌ছি। ফলমূল খেয়েও জীবন ধারণ কচ্ছি না ইত্যাদি।

তারপর ভাব্‌তে হবে—যাদের সেইরূপ কুঁড়েটিও নেই—তাদের কথা। তাদের চেয়েও ত আমার একটু আশ্রয় বা আশ্রম আছে!

তারপর ভাব্‌তে হবে—ত্রিতলে যদি আনন্দই থাক্‌তো তা হোলে রূপ রঘু অতুল সম্পত্তি ত্যাগ করে কাঙ্গাল হন কেন? শ্রীসনাতন ও পরশ পাথরের প্রসঙ্গটা ভালো করে চর্চ্চা কোর্‌তে হবে।

তখন দেখা যাবে—যেটা আমরা সহজে ত্যাগ কোর্‌তে সক্ষম নই, সেটা যদি আমাকে বহু বহু স্নেহের বশে সহজেই না দিয়ে থাকেন, তা হোলে আমার প্রতি তাঁর কত করুণা, কত স্নেহ, কত প্রেম প্রকাশ পাচ্ছে!!

লোভের জিনিস ছাড়াটা কত কঠিন ব্যাপার? লোভে পড়ে মাছ লোহার কাঁটা গিল্‌ছে! হাতী পায়ে শেকল পোর্‌ছে! মানুষ নির্ব্বাসিত প্রাণদণ্ডাদিষ্ট হচ্ছে!

সেই কঠিনতা যদি আমার জন্যে আমার প্রিয়তম মাপ কোরে থাকেন তবে ত তিনি আমার মঙ্গলই কোরেছেন।

বিত্তবৈভব উপার্জ্জনে যে সময় নষ্ট হয়, সে গুলি রক্ষণাবেক্ষণে যে জীবনকাল ব্যয়িত হয়, সেই সময়টা যদি আমার বেঁচে যায়, তবে আমিই

ত পুণ্যবান্—কেন না সেই সময়ে আমি গীতা ভাগবত চরিতামৃত পদ-পদাবলীর চর্চ্চা করিতে পারিব, তীর্থাদি পুণ্যধামে পর্য্যটন করিতে পারিব। কৃপা—বিষয়ী কে ? না নির্বিষয়ী কে ?

বিষয়ীর পরিণাম কি ? একটি স্থঁচও কি সে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে ? তবেই বিষয় সার্থক হয়—তবেই শ্রম সফল হয় যদি সে সেই অর্জ্জিত সম্পত্তি জীবহিতে—জগদ্ধিতে—সমাজহিতে দিয়ে যেতে পারে! এইরূপ ত্যাগই সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেয়েও বেশী। নচেৎ সেই বিষয় বিষক্রিয়া বলে কাকেও না কাকে উন্মার্গগামী করে মাত্র!

যে ভগবানকে ধর্‌তে বা বুঝ্‌তে পেরেছে—যে নিজেকে তাঁর দাস ভাব্‌তে পেরেছে—কাজে কাজেই সে আনন্দে মেতে আছে। তার কি আর কর্ম্ম হয় ?

সংসারেও তাই। জনসমাজে কখনো কোন দাসের কি দেনা পাওনা হয় ? হর্ষ-বিষাদ ঘটে ? দাস নিরূপিত কাজ করে চোলেছে—দেনা পাওনা, সুখ অসুখ তার প্রভুর। সে রোজগণ্ডা ও রোজ সই করার অধিকারী মাত্র। তাই শ্রীগীতা বলেন—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" "কর্ম্মে তব অধিকার ফল তব নয়।"

অধিকার মানে তুমি কর্ম্মের করণ মাত্র—যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রী বা কর্ত্তা বা ফলভোক্তা নও।

তাই ভক্ত এই 'ভক্তি'তেই গেয়েছিলেন—

"পুতুলবাজীর পুতুল আম্‌রা—
যেমন নাচায় তেম্নি নাচি।"

তাই ভক্ত রামপ্রসাদ গেয়েছেন—

"তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা!
লোকে বলে করি আমি!"

বাস্তবিকই মানুষের কর্ম্ম কতটুকু ? অধমের 'সন্তোষ' নামে একটি কবিতা আছে। তাহার কিয়দংশ এখানে দিয়া মানবের কর্ম্মের পরিমাণটা দেখাইব। পাঠকবৃন্দ ক্ষমা করিবেন !

কর্ম্ম কর্ম্ম কর্ম্ম মানবের কর্ম্ম
কতটুকু তাহা আহা !
সকল কাজের অধিকাংশ ভাগ
ঈশ্বর অধীন তাহা ॥
মনে কর তুমি ধান্য ফসল
করিবার কর মন।
তুমি কি কি কর ভাবিয়া দেখনা
বুঝিবে সেই সে ক্ষণ ॥
তুমি হল ধর গরু তাহা টানে
বৃষ্টি দেয় আখণ্ডল।
সহস্রটা তুমি একত্র হইয়া
পার কি রচিতে জল ?
শুধু বৃষ্টি হোলে হয় না কো চাষ
রোদও সময়ে চাই !
সে রোদ্ কে দেয় ? পার কি ডাকিয়া
আনিতে ভানুকে ভাই ?
পতঙ্গ মুষিক দেখা দিলে তাহা
পার কি হে নিবারিতে ?
কার করুণায় ফসল জন্মায়
হিম আসে কোথা হোতে ?

সুপক্ক ফসলে ঝড় বৃষ্টি হোলে
আসে কি ভবনে তাহা ?
কতটুকু তবে তোমার করম
বুঝিয়া দেখ না আহা ?
সবি তাঁর কর্ম্ম জীবে দয়াবান্
সততই সেইজন।
মিছামিছি নর নিজ কর্ম্ম ভাবি
ব্যথা পায় অকারণ ॥
মায়িক জনের মুখে শুনি শুনি
'কর্ম্মফল' সবে শিখে।
অজ্ঞানের ফলে নিজে কর্ত্তা সেজে
কর্ত্তায় কভু না দেখে ॥
স্বীয় কর্ম্মবশে সবি যদি হোতো
ঈশ্বর করিত কিবা ?
তাঁর উপাসনা কি আর হইত ?
শ্রীকৃষ্ণ ভজিত কেবা ?
মনে কর তব গাভীটি এবারে
প্রসবে পাইছে ক্লেশ।
তবে কেন ভাই ! ঠাকুরের ঠাঁই
'মানস' করিছ শেষ ?
গোবিন্দের কথা ভুলিলেই 'কর্ম্ম'
গোবিন্দ ভাবিলে নাই।
শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়া সন্তোষে যে আছে
করমে সে দেয় ছাই ! !

তাই ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন—

"কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং।
গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"
ভক্তিমান সেবকের কর্ম্ম-দগ্ধকারী।
সেই আদি গোবিন্দের উপাসনা করি ॥

যাঁরা বহির্ম্মুখ তাঁরা বাহিরেই দৃষ্টি করেন। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সকলেই তাই। বেদে আছে—

"পরাঞ্চিখানি ব্যতনোৎ স্বয়ম্ভূঃ"
খ গণেরে বহির্ম্মুখী করিলা স্বয়ম্ভূ।

বাহিরে বাহিরের বস্তুই দৃষ্ট শ্রুত হয় ভিতরের বা অন্তঃপুরের রত্ন দেখ্‌তে গেলে এই বহির্ম্মুখীন বৃত্তিগুলিকে অন্তর্ম্মুখীন করিতে হবে। তাই চোখ বুজে ধুনোর ধোঁ দিয়ে নিভৃতে ধ্যান ধারণার বিধি। ইহাই সাধনা বা উপায়। ইহারই ফলে সাধ্য বা উপাস্য তত্ত্ব দেখা যাবে।

নিরীশ্বরবাদীরা ঈশ্বরের কথা বলেন নাই। দেখেন নাই, তাই বলেন নাই। দেখলে নিশ্চয়ই বোল্‌তে হোতো। তা হোলে কর্ম্মফল-বাদ ভাষা সরস্বতী সম্মুখে স্থানই পেতো না।" শ্রীকৃষ্ণের কথা ভুলিলেই কর্ম্ম—শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলে নাই।" মায়াবাদী গোবিন্দকে ভুলেছিলেন—লোককেও ভুলিয়েছিলেন—তাই নিজ কর্ম্মের উপর নির্ভর কোর্‌তে হোয়েছিল।

কিন্তু সর্ব্বরসাধার শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে আনন্দ সন্তোষ শান্তি কেমন ক'রে আসবে? ভাই বঙ্গবাসী, ভাই বঙ্গভাষী, ভাই ভারতবাসী, ভাই বিশ্ববাসী তোমরা এই দুঃখাকর কর্ম্মফলবাদ একবারে ছেঁটে ফেল। উহা আমাদের বাঙ্গালীর প্রেমময় ঠাকুরের উক্তি কোন মতেই হ'তে পারে না!

তিনি আনন্দলীলাময় বিগ্রহ। করুণাবতারো। মহাপ্রেমরসপ্রদ। তিনি এই কর্কশ কঠোর কর্ম্মফলবাদের প্রচারক হ'তেই পারেন না!

একবার তাঁর মুখে নাকি এ নীতি বেরিয়েছিল—বোধ হয় সেটা দেশ-প্রচলিত মতের আবৃত্তি মাত্র। প্রতিধ্বনি মাত্র। তাঁর যথার্থ মনোগত ভাব নয়। যে আনন্দলীলাময় সে কর্ম্মফল বিধাতা—এ কথা স্বীকার কোত্তে পারি না।

মাধাইকে একবার শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন—শুনতে পাই। অপার স্নেহধাম শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যস্থতায় মহাপ্রভুর সে ইচ্ছা না কি ব্যর্থ হ'য়েছিল। হোতেও পারে, যুগাবতার যখন তার ভিতরেই ছিলেন—এটা হয় ত সেই যুগাবতারেরই কার্য্য। কিন্তু আমাদের প্রেমের ঠাকুর কুষ্ঠী বাসুদেবের প্রেমের অমৃতপ্রদ! তিনি কখনই দুঃখী তাপিতের তাপ-বর্দ্ধক নন। চাঁদের আলোয় আনন্দ আছে—তাপ নাই আর একবার ছোট হরিদাস প্রসঙ্গে নাকি বোলেছিলেন—"স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্।" এ কেমন কথা? ভক্তিশাস্ত্র তারস্বরে বোল্‌ছেন বৈষ্ণবের 'কর্ম্ম' হয় না! নিজেও বোলেছেন—"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপং অপি পুণ্যায় কল্পতে।" আবার সেই ঠাকুর রূপ বদ্‌লে বোল্‌বেন 'ফলভুক্ পুমান্'? এ কথাও বোলেছেন 'মা ফলেষু কদাচন।" "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু-যতাত্মবান্।"

এর এখন সামঞ্জস্য কোথায়? আমরা বলি, যদি বোলেই থাকেন—চরিতামৃত কাণে শোনা জিনিস নয় যে বা যাঁরা ঐ কথা বোল্‌তে শুনে-ছিলেন বা বোল্‌বার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁর বা তাঁদের মুখে শুনে কবিরাজ গোস্বামী লিখেছিলেন।

তা হোলেও এমন ত বলেন নি যে 'স্বকর্ম্মফলভুক্ জীবঃ' কি 'ফলভুক্ নরঃ'। তিনি বোলেছেন 'পুমান্।' পুমান্ শব্দে পুরুষ মাত্রকে বুঝাইবে

নারীকে বুঝাইতে পারে না। তা হোলে কর্ম্মফলের গণ্ডী থেকে স্ত্রীলোকেরা বাদ পোড়ে যান। তা তো হোতে পারে না। কর্ম্মের যখন ফল, তখন স্ত্রীপুরুষ সকলেই তাতে বাধ্য হবেন ত?

তা হোলে এই পুমান্‌টি কে? এই ফলভূক্‌ পুরুষটি কোন্‌ পুরুষ? ভক্ত মাত্রেই জানেন—"একলা পুরুষ কৃষ্ণ আর সব নারী"। এই পুরুষ সেই একলা পুরুষ কৃষ্ণ। সেই জন্য এক বচনে ব্যবহৃত হোয়েছে। পুং সঃ বলেন নাই। কৃষ্ণই কর্ম্মফলভুক্‌। ব্যবহারেও দৃষ্ট হয়—'এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু'।

'আর সব নারী।' সুতরাং আর সবের কেহই কর্ম্মফলভাগী নয়। ছোট হরিদাসও নয়। চাউল ভিক্ষা কর্ম্মও নয় সেবা মাত্র। সুতরাং তার ফলও নাই। তবে দণ্ড কেন? তাহা আমরা দুঃখবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে শীঘ্রই বলিব।

মানুষে বহির্ম্মুখে এই পুমান্‌ শব্দে ছোট হরিদাসকে বা তৎসদৃশ অন্যান্য ভক্তকে মনে কোর্‌তে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকলেই নিত্যদাস—কেউ ফলভোক্তা নয়!

কর্ম্ম সম্বন্ধে পুরাণশিরোমুকুট শ্রীমদ্ভাগবত কি বোলেছেন এবার দেখা যাক্‌।

একাদশ স্কন্ধে ২৩শ অধ্যায়ে তিরস্কার সহ্যকরণের উপায় বর্ণিত আছে। এই অধ্যায়ের ৪৯ সংখ্যক শ্লোকে বোলেছেন—"গ্রহগণকে যদি সুখ দুঃখের কারণ বলে, তাতে আত্মার কি?" (বঙ্গবাসীর বঙ্গানুবাদ)

"গ্রহা নিমিত্তং সুখ দুঃখয়োশ্চেৎ।
কিমাত্মনোঽজস্য জনস্যতে বৈ॥"

৫০ সংখ্যকে বোলেছেন—"যদি কর্ম্মকে সুখ দুঃখের কারণ বল, তাতেই বা আত্মার কি? কারণ, জড়ত্তা ও অজড়তা উভয় একের হইলেই কর্ম্ম সম্ভাবিত হয়। শরীর জড় আর এই পুরুষ শুদ্ধ জ্ঞানময় অতএব সুখ ও দুঃখের মূল কর্ম্মই নাই।" (বঙ্গবাসীর বঙ্গানুবাদ)।

কর্ম্মাস্ত হেতু সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনস্তদ্ধি জড়াজড়ত্বে।
দেহস্তুচিৎ পুরুষোঽয়ং সুপর্ণং
ক্রুধ্যেত কস্মৈ ন হি কর্ম্ম মূলম্॥"

নিত্যদাস জীবের যখন কর্ম্মই নাই, তখন কর্ম্মফল কোথা দাঁড়ায়? মাথা নেই মাথা ব্যথা হোতেই পারে না। তবে এই যে আমাদের প্রতীয়মান দুঃখ-দুর্দ্দিন, ব্যাধি-বিপদ, অভাব-অনটন এ গুলি কি? তাহা আমরা পরবর্ত্তী দুঃখবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে পর্য্যালোচনা করিব। ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করুন।

সম্পাদকীয়

সহৃদয় "ভক্তি" পাঠকগণ! আজ পত্রিকা-সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিবার জন্য আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি আশা করি কথাগুলি আপনাদের নিকট আমার নিবেদন রূপেই গৃহিত হইবে।

আজ সুদীর্ঘ কাল এই পত্রিকা পরিচালনায় ব্যপৃত থাকিয়া আপনাদের কিঞ্চিন্মাত্র সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভও যে আমার ঘটিয়াছে তজ্জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। জানি না আর কতদিন এ সৌভাগ্য অভাগার ভাগ্যে থাকিবে।

বর্ত্তমান সময় চতুর্দ্দিকে যেরূপ প্রবল প্রতিকূল ভাবের ঝড় বহিতেছে তাহাতে নিছক ধর্ম্ম-সম্বন্ধে দু'চার কথা লেখা একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকার অস্তিত্ত্ব এখনও যে আছে ইহাতেই পত্রিকার উপর আপনাদের অসীম কৃপার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে ভক্তি ৩১শ বর্ষে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন স্বার্থপর ধর্ম্ম বিদ্বেষী লোকের ঘৃণ্য আচরণে কিছু বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। বহু গ্রাহকের নিকট ভক্তির বার্ষিক মূল্য বাকী পড়িয়া আছে তথাপি আমরা তাঁহাদের সাধুতায় নির্ভর করিয়া নিয়মিত ভক্তি দিয়া আসিতেছি, তারপর কয়েকবার বিশেষ ভাবে বিজ্ঞাপন দ্বারা জানাইয়া গত আশ্বিন ও

কার্ত্তিক মাসের পত্রিকা ভিঃ পি করিয়াছিলাম। অনেক পূর্ব্বে নানা ভাবে জানান সত্ত্বেও বহু ভিঃ পি ফেরৎ আসিয়া আমাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বুঝিলাম না ইহার মধ্যেও কোন প্রতিহিংসা মূলক ষড়যন্ত্র আছে কিনা।

তারপর ছাপাখানার বিশেষ অব্যবস্থায় ও কাগজের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় যথাসময় নিয়মিতরূপে পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। বাধ্য হইয়াই কোন রকমে দুই দুই মাসের পত্রিকা একত্রে বাহির করিতে হইয়াছে। এজন্য যত কিছু ত্রুটী আমিই তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, সকলে আমার উপর ইহার জন্য যেরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন আমি আনন্দ মনে তাহাই কৃপাদণ্ড রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য।

এখন কথা হইতেছে এই যে, যদি আপনাদের আদর যত্নে প্রতিপালিতা এই "ভক্তি"কে বজায় রাখিতে হয় তবে সম্মিলিত ভাবে সকলকেই ইহার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে। আমি কোনরূপ আর্থিক সাহায্য চাই না; সকল গ্রাহক কিছু কিছু নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিন ইহাই আমার প্রার্থনা। আর প্রার্থনা, যাঁহার নিকট বার্ষিক মূল্য বাকী আছে তিনি উহা এই সময় পাঠাইয়া আমাকে সহায়তা করুন।

একে একে অনেকগুলি ধর্ম্ম পত্রিকা বন্ধ হইয়াছে কিন্তু যদি আপনাদের সহানুভূতির অভাবে এই সুপ্রাচীন পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে সত্য সত্যই বিশেষ পরিতাপের কথা।

বিলাস ব্যসনে কত বাজে খরচ হইতেছে, বৎসরে মাত্র দেড়টী টাকা দিয়া তাহার বিনিময়ে নানা ভক্তের মনোভাব, শ্রীভগবানের লীলা গুণ গান শুনিবার সুযোগ হারাণ কখনই যুক্তিসঙ্গত নয়।

আসুন, কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর—স্মরণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম, তাঁহার নাম প্রচারে অগ্রসর হউন, অর্থের ও সময়ের সদ্ব্যবহারই হইবে। নিজেরাও ধন্য হইবেন সঙ্গে সঙ্গে একখানি ধর্ম্ম পত্রিকার জীবন রক্ষা হইবে। আপনাদের সম্মিলিত চেষ্টা কখনই নিষ্ফল হইবে না।

"প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ !
অনাথিনী মায়েরে ছাড়িতে না জুয়ায়।
সবা লইয়া কর নিজ অঙ্গনে কীর্ত্তন,
তোমার নিত্যানন্দ আছয়ে সহায় ॥ ধ্রু।
তোমার প্রেমময় দুই আঁখি দীর্ঘ দুই ভুজ দেখি,
বচনেতে অমিয়া বরিষে।
বিনা দীপে ঘর মোর তোর অঙ্গে উজোর,
রাঙ্গা ছবি হেরিয়ে হরিষে ॥
প্রেম-সুখে কহে শচী বিশ্বম্ভর শুনে বসি,
যেন রামে কৌশল্যা বুঝায়।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
বৃন্দাবন দাস গুণ গায় ॥" (চৈঃ ভাঃ)

মায়ের কাতর বাণী করি আকর্ণন
ঝরিল নিমাই নেত্রে ধারা অনিবার ;
ছুটে যথা জল যন্ত্র-রন্ধ্রে অনিবার।
কহিলা কাতরে "মা ! মা ! কি বলিব আর ?
শুনিয়াছ সব, আমি শত অপরাধী
তোমার চরণে ; ক্ষম অক্ষম তনয়ে।
হায় মা, আপন বশে নাহি আমি আর,
কেহ যেন আকর্ষিছে দেহ মন প্রাণে,
অয়স্কান্ত মণি যথা লৌহে লয় টেনে।
যদি তুমি চাহ গৃহে রাখিতে আমায়,
এ প্রাণ যাইবে চলি বলি কানু পায়।

শুনিয়াছি কৃষ্ণপ্রাণা ব্রজবধূগণ,
এমনি ছাড়িল মাগো আপন জীবন।”
শুনি পুত্রপ্রাণা শচী মুগধের ন্যায়।
নিশ্চল নিস্তব্ধ হায়, রহে স্থানু প্রায়।
পুত্রের মঙ্গল মনে নিমেষে জাগিল
নিষেধ করিতে নারি মৌন রহিল।
মাতা পুত্রে কথা যবে ধীরে হ'তেছিল,
ধীরে যবে কৃষ্ণমেঘে চৌদিক ছাইল,
ধীরে ধীরে বিদ্যুৎবরণী এক বালা
বিদ্যুৎ সঞ্চারি তথা পাছে দাঁড়াইল।
উভয়ের কথা বালা নিস্তব্ধে শুনিলা ;
শুনি একি ! একি ! হায় ! পরাণ উড়িল !
শিথিল হইল অঙ্গ, মূরছি পড়িল !
নানা রত্ন বিভূষিতা সুচারু প্রতিমা
হেলায় বালকে অঙ্গ ভাঙ্গয়ে খেলায় ;
ঝটিকা বহিলে কিম্বা পুষ্পিতা লতিকা
পবন তাড়নে যথা ভূমে গড়ি যায় !
চারু চন্দ্রমায় হায় ! রাহু গ্রাস করি
করে তমসার সৃষ্টি চন্দ্রিকা আবরি,
দারুণ বারতা তথা তেমতি করিল
গ্রাসি সুখজ্যোৎস্না রাশি তমসা সৃজিল।

টঙ্কর মল্লার,—তাল লোফা।

হায়রে, প্রিয়া'জ গৌরাঙ্গচান্দের বক্ষবিলাসিনী
মরি ! ভাবি সে বিরহভাবি' সে ধরাশায়িনী গো;—

হায়রে, চঞ্চলা চপলা জিনি ছিল তনুখানি
মরি! নিষ্প্রভ মলিন এবে কিহেতু না জানি গো ;—
হায়রে, কোটি চন্দ্র জিনি চারু মুখ মনলোভা
মরি! রুচির সে মুখ শোভা এবে হতপ্রভা গো ;—
হায়রে, হেরিয়া পরাণে আর ধৈরজ না মানে
তেজিও না গোরাবিধু! নিবেদি চরণে হে ;—
ওহে, তুমিত করুণাসিন্ধু কোমল হৃদয়
বলি, দলিও না কমলিনী হইও না নিদয় হে।

———

পঞ্চম সর্গ

সন্ত্রাস

দাবানল তুই কেমনে জ্বলিস্
দহিস্ বিপিনে ঘন ;
মুহূর্ত্তে করিস্ ভস্ম অবশেষ
সুন্দর শ্যামল বন।
কাননাধিবাসী খগ মৃগ আদি
সন্তাপে জ্বালায় তব,
ভয়ে ভীত হ'য়ে ধায় চারি ভিতে
তুলে কি ত্রাসিত রব!

জ্বালাইয়া দিস্ তুই সুখ নীড়,
ভাঙ্গিস্ সুখের বাসা,
হারে সুখ শান্তি- হন্তা নিকরুণ!
নাহি পূরে তোর আশা!
ওই যে রে এক সুচারু নয়না
হাবণী আছিল সুখে,
শাবক তাহার স্তন পান করি
ঘুমাইয়া ছিল বুকে।
ওই যে রে এক মুগ্ধা কপোতিনী
সোহাগে পতির মুখে,
রাখি নিজ মুখ আনন্দ উচ্ছ্বাসে
পুচ্ছ নাচাল সুখে;
নিমেষে তাদের হরিলি আহ্লাদ;
কে কোথায় তোর ডরে
পলাইল হায়! মৃগী কপোতিনী
এখন জ্বলিয়া মরে।

* * *

হেথা জ্ঞানহীনা প্রায় শচীমাতা,
আপনার আঙ্গিনায়
একাকিনী ভাবি- বিরহ আতঙ্কে
পড়েছিল মৃতপ্রায়।
আসিয়া মালিনী তাঁরে গৃহে আনি,
বসিয়া পাশেতে তাঁর,

আশ্বাস সান্ত্বনা যত্নে দিতে ছিল—
"ভাবিও না সখি আর,
কোমল করুণ হৃদয় তেমন,
নবনীত-নিভ মন,
সে কি পারে শেল হানিতে মায়েরে
হইতে কঠিন হেন ?"
সেথা বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহের মাঝারে
ভূতলে মূর্চ্ছিতা হায় !
যথা বনলতা ঝটিকা তাড়নে
নির্ম্মমে ভূমে লুটায় ।
আসিল কাঞ্চনা কাঞ্চন বরণা
অমিতা অমিয় রাশি,
সখী চিত্রলেখা নেহারিল চিত্র,
তথায় তখনে পশি ।
সবার নয়নে বহে বারি ধার
সবার মনেতে দুঃখ,
প্রখর সন্তাপে হৃদয় গলিয়া
ঝরিতেছে বাহি বুক ।
বিষ্ণুপ্রিয়া মুখে সলিল সিঞ্চিয়া,
আপন অঞ্চল ধরি,
ব্যজন করিয়া গাহে সখিগণ
শ্রবণে 'গৌরাঙ্গ হরি ।'
শুনি অবিরাম গৌরহরি নাম
আসিল পরাণ ফিরি,

নয়ন মেলিয়া চাহি বিষ্ণুপ্রিয়া
সুধাইল ধীরি ধীরি—
"প্রাণ সই, তোরা শুনেছিস্ কিছু ?
বুঝি বা কপাল ভাঙ্গে !
কি হবে উপায় ? কে রোধিবে হায়
খরতর সে তরঙ্গে ?"
বলিতে আবার নিরাশা হুতাশে
কি যেন করিয়া দিল,
কি যেন বলিতে না বলিতে পুনঃ
কণ্ঠরোধ হ'য়ে গেল !
এলাইত দেহে রহিল পড়িয়া,
নেত্র জলে ভাসি পুনঃ
যত বলিবারে চাহে বিষাদিতা
কি ঝটিকা প্রকম্পন !
আদরে ধরিয়া কোলেতে করিয়া
কাঞ্চনা প্রবোধে তাঁরে
বলিছে তখন "শুন লো কাঞ্চনে !
আমিও না রব ঘরে।
চলিব চলিব প্রাণেশের সাথে,
নদী যথা বেগভরে
ধায় অনুরাগে কিছুই না মানি
সিন্ধুসহ মিলিবারে।
যে যে অবস্থায় বঞ্চিবে প্রাণেশ
নিব মানি তায় সুখ,

হ'লে অনুগামী ছায়ার মতন
ভরিবে আনন্দে বুক !
জানিস্ ত তোরা দময়ন্তী কথা,
অবলম্বি পতি-পদ ;
হেলায় ধাইয়া চলিল কাননে,
ত্যজি রাজ-সুসম্পদ।
জানিস্ ত তোরা রঘুপতি-পদ
হৃদয়ে ধরিয়া সীতা,
ভ্রমি বনে বনে কি পবিত্র চিত্র
দেখাল জগত মাতা।
উপরোধ তাঁরে করিস রে তোরা,"
—বলিতে না দিয়া আর,
কাঞ্চনা কোমল করেতে প্রিয়ার
মুছিয়া নয়নাসার—
তুলিয়া পালঙ্কে শোয়াইয়া তাঁরে,
কহিল সোহাগ-ভরে—
"শপথ আমার ভাবিস্ না আর,
কি আর বুঝাব তোরে ?
হারে পাগলিনি ! এতদূরই তোর
খেলিছে কল্পনা-গতি !
পতি ছেড়ে গেছে ! তুই তার পাছে !
বলি—কি হইল মতি ?
তোর প্রাণধন কঠিন এমন
কভু না হইতে পারে ;

কুসুমের দল মৃদুল কোমল,
সে যে আঘাতিতে নারে।
আয় আয় তোরে দিয়ে সাজাইয়ে ;
কেমন পুরুষ সে
দেখিয়া লইব ; ওরূপে না ভজি
ত্যজিবারে পারে কে ?"
বলিয়া আনিলা দর্পণ চিরুণী,
বাঁধিলা বিচিত্র বেণী ;
ঠিক যেন মাথে রয়েছে বেড়িয়ে
কৃষ্ণবর্ণ ভুজঙ্গিনী।
আনিল বিবিধ স্বর্ণ অলঙ্কার
পরাইল একে একে,
আনিল বিচিত্র কুসুম ভূষণ
শোভিল তা' ফাঁকে ফাঁকে।

* *

মৃদু ম্রিয়মাণা বালা বিষ্ণুপ্রিয়া
কিছু না কহিল মুখে ;
সখীর আশ্বাসে নহিল বিশ্বাস,
—চিন্তার অনল বুকে।

* * *

নিশীথে গৃহেতে আসি গৌর রায়
এই ছবি নিরখিল ;
হেরি বিরহিনী শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ
আরো প্রজ্বলিত হ'ল।

পালঙ্কের কোণে বসিল নীরবে,
—কি বন্যা বহিল নেত্রে!
হায় হায় তায় অবলা বালায়
বিদলিল অতিমাত্রে।

* * *

বহুক্ষণ গেল নীরবে রহিল
নীরবে ঝুরিল দোহে;
বহুক্ষণ অন্তে সুধীরে প্রিয়ারে
সুকরুণ স্বরে কহে—
"শুনিয়াছ প্রিয়ে! শুনিয়াছ মোর
হৃদয়ের যত ব্যথা,
মুখ ফুটে নিজে না পারি বলিতে
মুখে না নিঃসরে কথা।
তুমি পতিপ্রাণা তোমার বেদনা
জানি, আমা না দেখিলে
পলকে প্রলয় সদা তোর হয়,
বক্ষে দাবানল জ্বলে।
জানিয়া রে প্রিয়ে! এমত করিতে
কভু কি মানুষে পারে?
স্বাভাবিক জ্ঞান নাহিক রে আর,
কে যেন নিয়েছে হরে'!
কে যেন সবলে নিতেছে টানিয়ে,
করি যত্ন, ধৈর্য্য তরে;

পারি না প্রেয়সি ! জানি না কেমনে
যায় ধৈর্য্য রসাতলে !
মনে হয় প্রাণ এই বুঝি গেল !
তবে যে জীবন থাকে,
সে তব প্রেয়সি ! কপালের জোর ;
স্বরূপ কহিনু তোকে ।
তুমি একদিকে প্রেম স্বরূপিণী
সজোরে টানিছ মোরে ;
করে অন্য দিকে কৃষ্ণ আকর্ষণ,
প্রাণ কি রহিতে পারে ?”

* * *

নীরবে এ কথা বলিয়া প্রিয়ারে
আদর করিয়া ধরে ;
প্রফুল্ল যুগল কমল যেমন
সম্মিলিত বায়ুভরে !
একটি কুসুম উচ্ছ্বাসে অপরে
ঐ যে ধরিল বক্ষে !
করি দূরীকৃত তাপ খরতর
নিবা'ল দাহন দুঃখে ।
পতির প্রসর স্নিগ্ধ বুকে মুখ
রাখি কি হইল তাঁর,
বলিল—“প্রাণেশ ! যা' ভাল তা' কর,
আমার কি মত আর ?”

* * *

(তখন) আবার আবার আদরে সোয়াগে
কহিল গৌরাঙ্গ রায়,—
"প্রাণপ্রিয়ে! তোরে কভু কি গো পারি
ছাড়িতে রে অমায়ায়?
তুমি কিম্বা মাতা ভক্তগণ আর
যে বলিবে কৃষ্ণ হরি
তাঁর কাছে বাঁধা রহিব, না যাব
নিশ্চয় তাঁহারে ছাড়ি।"

* * *

শেষ না হইতে বদনের বাণী
বারাণ্ডায় বামা কণ্ঠে—
"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদনঃ"
গৌরহরি কৃত ধীরে মৃদুস্বরে
এই আদি গীতি উঠে।
ধীরে সমীরণ হইল কম্পিত,
কম্পিত বল্লরী শাখী;
নৃত্যশীলা ওই প্রকৃতি সুন্দরী,
গাইছে আনন্দে পাখী।
আনন্দ হিল্লোল ছুটিয়া চলিছে
চৌদিকে আনন্দ খেলে;
সঙ্গীতের তানে গৌরাঙ্গের প্রাণ
সবেগে মাতায়ে তুলে।

* * *

শুনি হরিধ্বনি আবেশে অমনি
প্রিয়ারে ধরিয়া বক্ষে ;
জ্ঞানহারা গোরা হরিধ্বনি করে
—অমিয়া ঝরিল কক্ষে।
সত্যব্রত নিজ পতি-প্রতিজ্ঞায়
আশ্বস্তা হইলা বালা ;
এতক্ষণে নভঃ নির্ম্মল হইল,
কাটিল সে মেঘমালা।

ষষ্ঠ সর্গ

প্রয়াণ

ভুলিও না নীলনভঃ নেহারি নির্ম্মল,
ভুলিও না স্থির শান্ত হেরি চরাচর ;
মুহূর্ত্তে ভাবের হয় কি পরিবর্ত্তন !
মুহূর্ত্তে উঠিতে পারে ঝটিকা ভীষণ !

বিষ্ণুপ্রিয়ারে পরে গোরা অবিরাম
দিয়া প্রেমানন্দ যত্নে তোষিলেন নিতি ,
কহি কৃষ্ণ প্রসঙ্গ অনন্ত অভিরাম
তোষিলেন ভক্তে ; করি যতন পিরীতি।

যদিও ভুলিল সবে সন্ন্যাসের কথা,
তবু মাঝে মাঝে মন উঠিত কাঁপিয়া ;
অনিষ্টের আশঙ্কায় বন্ধু-চিত্তে ব্যথা
জাগে অনুক্ষণ, উঠে পরাণ কাঁদিয়া।

যখন বহিত বায়ু করি স্বন স্বন
আবরিয়া হৃদাকাশ মোহ বালুকায়,
স্বভাবের সুবিধানে পরে কিছুক্ষণ
সুস্থির হইত চিত্ত আত্ম-সান্ত্বনায়।

সহচরিগণ সদা থাকিত বেড়িয়া
শোভয়ে নক্ষত্র যথা চন্দ্রমার পাশে ;
সখী সান্ত্বনায় চিত্তে উদ্বেগ জাগিয়া
নারিত দলিতে ; তবু কাঁপিত তরাসে।

বিপদ ও সম্পদের ভাবি ছায়াপাত
হয় নাকি সুনির্ম্মল মানস-পটেতে ?
চিত্তে তাই বুঝি শঙ্কা সদা উপজিত,
কিছুমাত্র উৎসাহ না থাকিত মনেতে।

একদিন কি দারুণ ঝঞ্ঝা বহি গেল,
অকারণ ঝরিতে লাগিল নেত্র বারি ;
কি প্রচণ্ড প্রকম্পনে হৃদয় দোলিল !
কি সন্তাপে বিদলিত হইল কিশোরী !

ভাবঘোরে যবে বিষ্ণুপ্রিয়া অভিভূতা
হইত, তখন সখীজনেরা মনেতে

বহিত সে ভাবস্রোত,—হ'ত বিচলিতা ;
প্রতিভাত জ্যোৎস্না যথা প্রতি তরঙ্গেতে।
তখন কাঞ্চনা সহ অমিতা সুন্দরী
আছিলেন ম্লানমুখে বিষ্ণুপ্রিয়া পাশ।
তুলিল তাঁহারা গৌর কথার লহরী,
চিত্তগ্লানি তাতে কিছু করিল বিনাশ।

তখন, (প্রাচীন পদে—)

"বিষ্ণুপ্রিয়া সখীজনে কহে ধীরে ধীরে
আজি কেন প্রাণ মোর অকারণ ঝুরে ?
কাঁপিছে দক্ষিণ আঁখি কেন স্ফুরে অঙ্গ,
না জানিয়ে বিধি কিয়ে করে রস ভঙ্গ।
আর কত অস্ফুরণ স্ফুরয়ে সদায়,
মনের বেদন কহিবারে পাই ভয়।
আরে সখি ! পাছে মোর গৌরাঙ্গ ছাড়িবে !
'মাধব' এমন হৈলে পরাণে মরিবে।"

শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া বাণী কাঁপিল পরাণি,
চারুনেত্র সখীদের করে ছল ছল ;
শিশির পূর্ণিত যথা কমলের দল
সমীরণ সঞ্চালনে ঝরিবে অমনি।
যে তমসা ঘনঘোর আকাশের প্রান্তে
ধীরে ধীরে ধীরে হয়েছিল সঞ্চারিত,
তাহার প্রভাবে এক ম্লানিমা দিগন্তে
ছড়াইয়া করেছিল দিক ধূমায়িত।

সহচরী ধৈরজ বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া
একমনে সযতনে সাজাইল ধনী ;
ভাতিল লাবণ্য জিনি স্থির সৌদামিনী ;
সখীরা বিস্মিতা সেই রূপ নেহারিয়া
কাঞ্চনা আনিয়া পান মাল্য চন্দন
দিয়া হাতে পাঠাইল সম্ভাষিতে পতি।
সখীর ইঙ্গিতে কক্ষে চলে ধীরগতি ;
মনে মনে পতিপদ করিয়া বন্দন।
আজি গৃহে আগেই আসিয়াছিল গোরা ;
হ'য়ে অগ্রসর দ্বার সন্নিকটে আসি
বিষ্ণুপ্রিয়ারে ধরি নিল হাসি হাসি ;
(প্রিয়ার) সে আদরে নেত্রে বহে আনন্দের ধারা ॥
ভাতিল বদন যথা মেঘাবৃত শশী ;
মৃদুল কিরণে মাখা মেঘ খণ্ড প্রায়
নীলিমা মণ্ডিত এক উজ্জ্বল আভায়
শোভিল বদন চারু ; শোভিল সে হাসি।
আরও পতির যত্ন ;—চিত্ত অবসাদ
পলাইল ; ভানুর কিরণ পরশনে
কাটে কুজ্ঝটিকা যথা ; সে ক্ষুদ্র বদনে
মেঘমুক্ত শশী প্রায় ভাসিল প্রসাদ।
ত্রিদিব-নিবাসী কোন কপোত কপোতী
ত্রিদিব-বিজয়ী প্রেমে সাঁতারিছে যেন।
অপার্থিব প্রেমশক্তি অকথ্য কথন
কাটাইল অবসাদ বিষাদ অশান্তি।

স্বগত ভাবয়ে গোরা—'নারী চিত্ত ধন্য!
কি পবিত্র কি সরল!—একটু আদরে
যায় গলে—দেয় হৃদি দ্বার মুক্ত করে;
পতি প্রেমে থাকে চিত্ত সদায় সুপূর্ণ।
বিচ্ছেদের ঝঞ্ঝাবাতে আকাশ ভাঙ্গিয়া
পড়িলে মাথায় হায় সহিবে কেমনে?
সরলা রমণী ক্ষীণা, কিছুই না জানে!
নিশ্চয় যাইবে তবে মাটিতে মিশিয়া!
হায় নারী! হায় প্রিয়ে! বল কি করিব?
শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রাণ নারি যে রাখিতে;
জল বিনে মীন যথা না পারে থাকিতে;
—যাইব যাইব আমি অবশ্য যাইব।
যাইব অবশ্য; "প্রিয়" আমারি ত প্রিয়া;
আছে শিক্ষা আছে শক্তি সহিবার তরে
দিয়া আত্মবলি হায় পাঠাইতে মোরে
অজ্ঞাত অনন্ত পথে জীবের লাগিয়া।'
আবার জাগয়ে মনে প্রিয়ার বেদন,
অমনি বিষাদ ক্লিষ্ট! তাই সযতনে
—কোমল-হৃদয় গোরা—ধৈর্য্য ধরি মনে;
প্রিয়ারে প্রবোধি বলে মধুর বচন—
"কেন প্রিয়ে! প্রফুল্লিত না হেরি তোমায়,
বদন সরোজে তব জ্যোৎস্নার সঞ্চার
হেরিলে আনন্দে চিত্ত নাচে অনিবার,
না জানি তরঙ্গে ক্ষীপ্ত নেয় রে কোথায়!

১৩০৮ বঙ্গাব্দে

নিত্যধামগত দীনচন্দ্র কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ভক্তি

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা ।

৩১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

চৈত্র ১৩৩৯

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নানাপ্রকার অসুস্থতায় এবার পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হইল, আগামী বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ তুই মাসেব একত্রে শীঘ্রই প্রকাশেব বন্দোবস্ত হইতেছে। পাঠকগণ বিলম্বের জন্য ক্ষমা করিবেন।

বিনীত—

ভক্তি-কার্য্যাধ্যক্ষ

বাৰ্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১৷৷০ দেড টাকা
নমুনা প্রতি খণ্ড ৵০ তিন আনা, ভিঃ পিতে ৷৵০ আনা

ভক্তি-সম্পাদক—

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন সম্পাদিত

স্বচীপত্র

সম্পাদক কর্তৃক মাসিক "ভক্তি-নিকেতন" পোঃ আন্দুল-মৌড়ী হাওড়া হইতে প্রকাশিত
ও কলিকাতা ৭৭নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

৩১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

চৈত্র ১৩৩৯

দুঃখবাদ-খণ্ডন।

(শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি, এল।)

'কর্ম্মফল-বাদ খণ্ডন' প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, ভক্তের কর্ম্ম নাই। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এই তিন গ্রন্থ-রত্নই এক বাক্যে বলিয়াছেন ভক্ত দাসের কর্ম্ম হয় না। কারণ সে 'অহং কর্ত্তা' অভিমান রাখে না। ইহাও অবিসম্বাদিত যে, জীব মাত্রই নিত্যদাস। সুতরাং জীবের কর্ম্ম নাই।

কর্ম্মই যখন নাই, তখন কর্ম্মের ফল থাকিবে কিরূপে? ফল না থাকিলে দণ্ড বা পুরস্কার হয় না। তা হ'লে জগতের এই হাসি কান্না, এটা কি? এগুলো কি আমাদের প্রাক্কর্ম্মের ফল স্বরূপ দণ্ড পুরস্কার নয়? এই যে এত দুঃখ এ ভবে আসে কোথা থেকে? এই দুঃখবাদের মূলটা আমরা এবারে দেখ্‌বো। অন্বেষণ কোর্‌বো।

গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্ম মতের সার কথা দুইটী। প্রথমটির নাম 'দ্বাদশ নিদান' বা কারণ। দ্বিতীয়টির নাম 'চারি প্রকার আর্য্য সত্য'। এই দ্বিতীয়টিই দুঃখবাদ। ইহার প্রথম কথা সত্য দুঃখ কি? উত্তর—জন্ম, জরা, ব্যাধি, অপ্রিয় সংঘটন, অভিলষিতের অপ্রাপ্তি ইত্যাদিই দুঃখ। দ্বিতীয় সত্য দুঃখের উৎপত্তি-হেতু কি? উত্তর—তৃষ্ণা বা বাসনা। তৃতীয় কথা দুঃখ-নিরোধ কিসে হয়? উত্তর—তৃষ্ণাহারী বৈরাগ্যে, শেষ কথা

দুঃখ নিরোধ করার পন্থা কি? উত্তর—অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ নিরোধ করে। অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? উত্তর—(১) সম্যক্ দৃষ্টি, (২) সম্যক সংকল্প, (৩) সম্যক্ বাক্য, (৪) সম্যক্ কর্ম্ম, (৫) সম্যক্ জীবিকা, (৬) সম্যক্ ব্যায়াম, (৭) সম্যক্ স্মৃতি ও (৮) সম্যক্ সমাধি।

(১) সম্যক্ দৃষ্টি কি? উত্তর—দুঃখ, দুঃখ-হেতু, দুঃখ-নিরোধ এবং দুঃখ নিবৃত্তির উপায় এই চারি আর্য্য সত্য দর্শন করাই সম্যক্ দৃষ্টি।

(২) সম্যক্ সংকল্প কি? উত্তর—নৈষ্কর্ম্ম, অহিংসা ও অব্যাপাদ বা হত্যাভাবকে সম্যক্ সঙ্কল্প বলে।

(৩) সম্যক্ বাক্য কি? উত্তর—মিথ্যা কথা, লাগান ভাঙ্গান আদি পিশুন কথা, পরুষ বা রূঢ় কথা ও বৃথা বাক্য হইতে বিরতিকে সম্যক্ বাক্য বলে।

(৪) সম্যক্ কর্ম্ম কি? উত্তর—মিথ্যা কর্ম্মের বিপরীতকে সম্যক্ কর্ম্ম কহে। এই মিথ্যা কর্ম্ম ত্রিবিধ—প্রাণি হনন, পরধন হরণ ও মৈথুন।

(৫) সম্যক্ জীবিকা কি? উত্তর—মিথ্যা জীবিকার বিপরীতকে সম্যক্ জীবিকা বলে। মিথ্যা জীবিকা যথা—মাছ, মাংস, প্রাণী, অস্ত্র ও বিষের ব্যবসা, উৎকোচ গ্রহণ, বাস্তুবিদ্যা, মূষিক বিদ্যা, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা। এই সকল মিথ্যা জীবিকা বর্জ্জন করিয়া সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জনকে সম্যক্ জীবিকা কহে।

(৬) সম্যক্ ব্যায়াম কি? উত্তর—আত্মজয়। অর্থাৎ পাপ মুক্ত ও পুণ্যে পূর্ণ থাকা। ইহাই বৌদ্ধ বীরত্ব।

(৭) সম্যক্ স্মৃতি কি? উত্তর—যোগাভ্যাস।

(৮) সম্যক্ সমাধি কি? উত্তর—কামনা ও পাপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধ্যান; বিচার বিতর্কের অভাব কেবল সমাধির সুখ ও প্রীতি; সুখে দুঃখে সমভাব ইত্যাদি। কিন্তু শাক্যসিংহ এই সোপানে

পৌঁছিয়াও আমিত্ব, অজ্ঞান, তৃষ্ণা ও দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইতে পারেন নাই। তজ্জন্য পুনরায় ধ্যান করেন ; পরে সিদ্ধার্থ হন।

অতএব দেখা গেল যে, এই দুঃখবাদ বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার কথা ও সর্ব্বস্ব। ইহাই আমাদের সনাতন ধর্ম্মের কথা স্বরূপে এখন আমাদের দেশকে অধিকার করিয়া আছে।

অবশ্য বৌদ্ধমতের মূল সাংখ্য প্রবর্ত্তক কপিল ঋষি। তারও মূল বৃহদারণ্যক উপনিষদ্! কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৌদ্ধমতই আমাদের এই দুঃখবাদ ও কর্ম্মফল বাদের জন্য দায়ী।

বৌদ্ধমতে দুঃখ-কর্ম্ম ফল, কিন্তু সেই ফলের বাহক আত্মা নাই। সাংখ্য ও আত্মাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন—লিঙ্গশরীরকে কর্ম্মফল বাহী বলিয়াছেন। উপনিষদে কিন্তু কর্ম্মফল বাহী-আত্মা। বৌদ্ধ দর্শনে আত্মার আত্মা পরমাত্মার উক্তিও নাই। কিন্তু গীতার উক্তি—'মা ফলেষু কদাচন।' দুঃখ "তৎকুরুস্ব মদর্পনম্" "সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগং ততঃ কুরু অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্ততে" ভাগবত বোলেছেন "নহি কর্ম্ম মূলম্।" চরিতামৃত বলেন—'একলা পুরুষ কৃষ্ণ আর সব নারী।' 'ভূমিষ্ঠ হইতে মায়া জ্ঞান হরি নিল।' "মায়া বদ্ধ জীবের নাই স্বতঃ কৃষ্ণ জ্ঞান।" "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। সে কারণে মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।" অর্থাৎ দুঃখের কারণ জীবের কর্ম্ম বা কর্ম্মফল নয়—কৃষ্ণ বিস্মৃতিই দুঃখের নিদান। ব্যবহারেও দেখা যায়—এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পনিমস্তু। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" "তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা! লোকে বলে করি আমি।"

যাইহোক্ এই সকল বিভিন্ন মত ও শাস্ত্র বাক্য সাধারণের আয়ত্ত হওয়া দুরূহ। সেজন্য আমরা সরল ভাবে জগতের দুঃখগুলি পরীক্ষা করিয়া দুঃখ বাদ খণ্ডনের প্রয়াস পাইবে।

প্রথমতঃ দুঃখের কয়েকটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক্।

(১) কোন ছাত্র এম, এ পরীক্ষা দিবে। সে অনেক দুঃখ মেহানত্ কোরে, রাত্ জেগে, সুখ ভোগ ছেড়ে পড়া শোনা কোর্‌ছে। এই যে দুঃখ—একি তার পূর্ব্ব কর্ম্মের দণ্ড ?

(২) কোন জননীর প্রসব বেদনা উপস্থিত। কি দারুণ কষ্ট! কি মর্ম্মান্তিক বেদনা! এটাও কি তার পূর্ব্ব কর্ম্মের দণ্ড ?

(৩) একজন সেনাপতি যুদ্ধ ক্ষেত্রে বা এক জন পোতাধ্যক্ষ সমুদ্রে প্রাণ দিলেন।

(৪) ছোট হরিদাস মহাশয় প্রিয়তমের অদর্শনে প্রাণ দিলেন।

(৫) কেহ অর্থাভাবে খাইতে পরিতে পাচ্ছেনা। গ্রাসাচ্ছাদন বিনা কষ্ট পাচ্ছে। ইত্যাদি।

আমাদের ঐ ১ম দৃষ্টান্তের উত্তর কি হইতে পারে ? পূর্ব্ব অন্যায়ের দণ্ড ফলে কি ছাত্রেরা কষ্ট কোরে পড়ে ? কখনই হোতে পারে না। কষ্টটা পূর্ব্ব পাতকের প্রায়শ্চিত্ত নয়। ভাবী সুখের সেতু বা সোপান মাত্র। "দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ? এ সেই সুখ লাভের আয়োজন মাত্র। এর প্রয়োজন সুখ—উন্নতি,—সুতরাং এই আয়োজনটাও সুখ।

২য় দৃষ্টান্তের উত্তর ও ঐরূপ। এত যে মা বেদনা সহ্য করেন—সে সেই নবজাত কুমারের চাঁদমুখ দেখ্‌বার আনন্দ মনে মনে ভেবে নিয়ে। নৈলে এত ব্যথায় কি কোমলাঙ্গীর প্রাণ থাকে ? সেই চাঁদমুখ হ'তে যে কৌমুদীধারা তাঁর হৃদয়কে প্রতিনিয়তই নূতন আনন্দ দিবে—সেই আনন্দ আশাই মায়ের প্রাণকে বাঁচাইয়া রাখে। এও সেই সুখের তরেই দুঃখ।

৩য় দৃষ্টান্তে যোদ্ধাপতি বা নৌনায়ক যে প্রাণ দিচ্ছেন—সেটা কি

তাঁর জননী জন্মভূমিকে বড় করার জন্য নয়—সুখী করার জন্য নয়? ভীষ্ম দ্রোণাদির প্রাণপাত কি পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত?

৪র্থ দৃষ্টান্তে ছোট হরিদাস মহাশয় যে প্রাণ উৎসর্গ কোল্লেন, সেটাকি তাঁর ভালবাসার বস্তুর প্রিয় সাধনার্থে বা সে বুদ্ধির বশে হয়নি? মহাপ্রভু তাঁর গণকে সাবধান করার জন্য একটা সাইন্‌বোর্ড্ বা দৃষ্টান্ত রেখে যেতে চান! এখন এই সাইন্‌বোর্ড্ বা চিহ্নস্তম্ভ হয় কে? প্রভুর এই কার্য্য—এই সেবা করার যোগ্য সেবক কোথায়? এ সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ কর্‌তে হবে! জীবনটা বজায় রেখে সেবাত অনেকেই কর্‌তে পারেন। কিন্তু জীবন দিয়ে সেবা বোধহয় এক 'জটায়ু' ছাড়া বিরল।

যাঁরা মনে করেন সেবা কোর্‌বো—সুখে থাক্‌বো। তাঁদের এখনও 'সেবা' জিনিসটা বোঝা হয় নি। সেবা চার্ জন করে। দাস, সখা, গুরুবর্গ প্রেয়সীগণ। শান্তেরসম্বন্ধ নির্ণয়ই হয় নাই সুতরাং সেবাও নাই। দাস্য থেকেই সেবার সুরু। দাস্যটী প্রেম-রথের দ্বিতীয় তল। প্রেমের খেলা বা অভিব্যক্তিকে একটি পাঁচ তোলা রথ মনে করিলে—সেই রথের প্রথম তলে শান্তদের স্থান বা খেলার যায়গা। ২য় তলে দাস্য বা দাস মণ্ডলীর মেলা। ৩য়ে সখ্য বা সখাগণের খেলার আখ্ড়া। ৪র্থে জনকজননী আদি-গুরুগণের পালনালয় আর ৫ম বা সর্ব্বোচ্চ তলে প্রেয়সীগণের লীলাকুঞ্জ।

অথবা প্রেমকে যদি একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক ধরা যায় ইহার ১ম অঙ্কে শান্তদের পালা। ২য় অঙ্কে দাসগণের রঙ্গভূমি। ৩য়ে সখা সহ ক্রীড়া। ৪র্থে জনক জননী আদি গুরুজনগণের পোষণ লীলা। ৫মে কান্তাগণ সহ মধুর মিলন।

তবেই বোঝা গেল যে সেবা চারি প্রকার। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এ গুলি সবই প্রেম। প্রেমে আত্মসুখ চেষ্টা বা বাসনা নাই। সুখ বাসনা থাক্‌লেই সেটা কাম—প্রেম নয়।

তাহোলেই বেশ বোঝা যাচ্ছে না কি—যে, যাঁরা মনে মনে ভেবে নিয়েছেন যে, সেবা কোর্‌বো আর সুখে থাক্‌বো বা ভগবান আগে সুখে রাখুন তবে ত তাঁর সেবা কোর্‌বো—তাঁদের সেই ভাবটা প্রেম রাজ্যের জিনিস নয়। সেটা আত্ম সুখ বাঞ্ছা-দূষিত। সেটা না শান্ত, না দাস্য, না সখ্যবাৎসল্য-মধুর। কোনটাই নয়।

সেবা বুদ্ধি যার আস্‌বে সে এক কুঁজা জল আর তুলসী মঞ্জরী নিয়ে বোসে যাবে। পরম পূজ্য দাস গোস্বামী মহাশয়কে মহাপ্রভু যখন সেবা দিয়েছিলেন তখন রঘুনাথের অবস্থা কি সকলেই ভেবে দেখুন। তখন তাঁর কি বিত্ত-বিভব ছিল? আজ আমরা বিত্ত বিভব না হোলে সেবা কোর্‌তে কিছুতেই চাই না। অতএব এজগতে কেবল কামেরই খেলা—উহা প্রেমের সেবা নয়।

কিন্তু আমাদের ছোট হরিদাস মহাশয় কি এই কামরাজ্যের সাধক? তিনি কি আত্মসুখের জন্য চাউল ভিক্ষায় গেছ্‌লেন?

তাঁর সেই চাউল বদ্‌লানো ব্যাপারটিও প্রেমের পরিণাম। আর তার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করাও সেই প্রেমেরই পরা কাষ্ঠা। চাউল ভিক্ষাটি কর্ম্ম নয় এবং মহাপ্রভু যে তাঁকে দর্শন সুখ মানা কোরেছিলেন সেটাও কর্ম্মফল নয় বা আমাদের মাথার মণি সেই ছোট হরিদাস মহাশয় যে চাঁদমুখ দর্শন বিনা প্রাণকীট রাখ্‌লেন না, সেটাও কেবল প্রিয়-পরিবর্জ্জন নয়—প্রাণ-কীট তাঁর প্রিয় ছিল না—প্রাণ-পতিই তাঁর প্রিয়তম ছিলেন। তার প্রমাণ, বিদেহ অবস্থাতেও তিনি তাঁর প্রাণপতিকে সেই চিরভ্যস্ত গান শোনাতেন। আমরা হোলে রাগে আর কাছেই ঘেস্‌তুম না—তা গান শোনান ত অনেক দূরে! তবেই বুঝুন আমাদের ভাব আর মহাপ্রভুর সঙ্গীগণের ভাব আস্‌মান্‌ জমিন্‌ ফরাক। কর্ম্মও কর্ম্মফলগণ্ডীর বহু উচ্চ ভূমিতে বহু উন্নতধামে এই প্রেম-সেবার লোক।

রায় রামানন্দ-সংবাদে সেবা বা দাস্য প্রেম সপ্তম সোপান। তার পূর্ব্বে আর ছয়টি সোপান পর পর অতিক্রম কোরে তবে দাস্য পাওয়া যায়। প্রথম সোপান বিষ্ণু পুরাণের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। ২য় গীতার—মদর্পণ-সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগ ৩য়—ধর্ম্ম ছেড়ে ধর্ম্মীকে ধরা ৪র্থ—ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি—সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিংলভতে পরাং॥ তখন—ভক্তি। ৫মে নিগুর্ণ ব্রহ্মণানুসন্ধান-রহিত ভক্তি বা লীলাময়ের চরণাশ্রয়। ৬ষ্ঠে—বাহ্য পূজা গিয়ে মানসোপচারের পূজা। তারপর ৭ম সোপানে দাস্য প্রেম—যেখানে আমাদের সেবা ধর্ম্ম—বা সেবা ভক্তির আরম্ভ, সুতরাং হরিদাসের দণ্ডাদি লীলা জগতের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের বহু বহু উচ্চে অবস্থিত। তার সমালোচক বা বিচারক কাম- রাজ্যের লোকনয়।

একবার আমাদের ৫ম দৃষ্টান্তের দুঃখ পরীক্ষা কোরে দেখা যাক্। ৫ম দৃষ্টান্ত হোচ্ছে অর্থ-হীনতা। ৪র্থ দৃষ্টান্তটি বুঝিতে অনেক সময় গেছে সুতরাং এটিতে আমরা বেশী সময় দিব না। এক কথায় উত্তর দিতে গেলে অর্থাভাব, গৃহাভাব, বস্ত্রাভাব পাপের দণ্ডনয়। আমরা কামকলুষিতচিত্ত—আমাদের মন নিষ্কিঞ্চন হয়নি—কাজেই আমরা অভাবগুলিকেপাপের দণ্ড বোলেই বুঝি।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ অভাবগুলি বাগানের বেড়ার কার্য্য করে। বেড়া না থাক্‌লে বাগানে গরু ছাগল ঢোঁকে এবং যা দু' একটা চারা বা অঙ্কুর থাকে সে গুলোকে নষ্ট কোরে দেয়। কিন্তু বেড়া থাক্‌লে গরু ছাগল আস্‌তেই পারে না। ঠিক্ সেইরূপ অভাব থাক্‌লে কেউ তোমার সঙ্গ কোর্‌তে চায়না। কাছে আসেনা। তোমাকেও ঘেস দেয়না। তুমি অনেক প্রলোভন থেকে বেঁচে যাও। আর অভাব যদি না থাকে—কুসঙ্গের আশঙ্কাই অধিক—যারা গরু ছাগলের মত তোমার হৃদয় উদ্যানের সদ্‌বৃত্তির অঙ্কুর বা চারাগুলিকে মুড়িয়ে দেয়।

'যদি হরি-স্মরণে সরসং মনঃ' কোর্‌বার বাসনা তীব্র হয়—তখন

নিজে নিজেই বিষয় বিষ, সম্পদ আপদ, গৃহ, বস্ত্র—অস্ত্র ফেলে, কুলশীল-লজ্জা ধৈর্য্য ছেড়ে সাগর-সঙ্গিনী তটিনীর মত মানুষ কি অভিসারে ছোটে না? ঐ দেখুন্ লালা বাবু—এই সেদিন কি কোরে ছিলেন? ঐ দেখুন সপ্তগ্রামের বৈষ্ণববীর—খেতরির দত্ত—রাজকুমার নরোত্তম কি কোরে ছিলেন? শ্রীরূপ শ্রীসনাতন কি কোরে ছিলেন?

গাড়ীঘুড়ী, ঘড়বাড়ী, পাগ্‌পাগ্‌ড়ী কি ভগবৎকৃপা? শ্রীচরিতামৃতে শ্রীভগবান বলেন নাই কি,—"সেই মূর্খ—আমি তারে বিষয় কেন দিব! স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥" লঘু ভাগবতামৃতে শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদ বোলেছেন—এই যে সব দুঃখ—এঁরা হচ্ছেন সাধু-সাধনা এঁরা বাড়ীতে এলেই কৃষ্ণকথা হয়। নচেৎ হয়না। তাইতো বসুদেব দেবকীর কারা ক্লেশ—দ্রৌপদির বস্ত্রাকর্ষণ, কুন্তীর বিপদ-সাগর! বিনা কষ্টে কি কৃষ্ণ মিলে?

এ প্রসঙ্গের আর একটা দিক্ আছে। ভগবান—প্রেমময়-ভগবান বাঁশী-হাতে-ভগবান ভিখারী ভগবান দণ্ড যে দিবেন, কেন? কিসের জন্য? "ভবন্তি ভাবাঃ ভুতানাং মত্তঃ এব পৃথগ্‌বিধা জীবের যখন যে ভাব তা আমা থেকেই হয়। তিনিই কাঁঠাল চুরি করালেন—তিনিই আবার দণ্ড দিবেন? এ কি হ'তে পারে? দণ্ড নয় লীলা।

আপনার নাবালক শিশুটি যদি একটা অন্যায় অসৎ কাজই কোরে ফেলে—আপনি তাকে কি করেন? উত্তর দিবেন—মারি? কিন্তু সে মার্‌টা কি খুন্ জখম্‌ না রোগের ওষুধ খাওয়ানো? রোগের ওষুধ কি স্নেহের—প্রেমের পরিচয় নয়?

আমরা যে যত বয়সেরই হই না কেন, যার যত জ্ঞান গুণ বিদ্যা হউক না কেন, যার যত মান মর্যাদা পদ গৌরব থাকুক না কেন—সেই অনাদি অনন্ত সর্ব্বশক্তিমানের নিকটে আমরা প্রত্যেকেই কি সপ্তমবর্ষীয় শিশু নই? তবে কেন দণ্ড হবে—কেন দুঃখ দেবেন?

এমন যে দণ্ডবিধি আইন তাতেও শিশুদের সাতখুন মাপ! আর প্রেমময় ভগবান প্রেমের ঠাকুর কি আমাদের দণ্ড দেবার জন্য বেত উঁচিয়ে আছেন?

কখনই নয়। তাঁর হাতে কোন দণ্ড—কোন যষ্টি নাই। এক গাছা ছিল—তাও দয়ার অবতার শ্রীনিতাই খণ্ড খণ্ড কোরে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে সাগরে—প্রেম-সিন্ধুতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর আমাদের সেই রামেশ্বর? তাঁর হাতেও মুরলী—নাচ গান আনন্দ তুফানের সুধা—ভগবান সুখ—সাধন বাঁশরী যন্ত্র? দুঃখ কোথায়? দণ্ডই বা কোথায়? ভক্তের কর্ম্ম ও নাই, দণ্ডও নাই— দুঃখ ও নাই। সকলই সেবা—সকলই সুখ—আনন্দ।

তবে যে প্রারব্ধ, সঞ্চিত, হেন, তেন শাস্ত্রে দেখা যায় সে কেবল কৃষ্ণোন্মুখ কোরবার জন্য। যেমন ছেলেদের,—মা জুজুর ভয় দেখিয়ে ভাল করেন। সেই রকম আমাদের কোটী মাতৃ স্নেহ-পূর্ণ শ্রীভগবান আমাদিগকে মায়ার হাত থেকে সরিয়ে নেবার জন্যে—ঐ সব প্রারব্ধাদির কথা ভয় দেখিয়েছেন। এক বার কৃষ্ণ তোমার হোলেম' বোলতে পাল্লেই ও সব কর্ম্ম টর্ম্ম কোথায় ধপ্ কোরে তলিয়ে যায়!

তাই কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় কোন কর্ম্মের কথা তোলেন নি? তিনি বোলেছেন—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়,
দণ্ড্য জনে রাজা যথা নদীতে চুবায়॥"

কৃষ্ণকে ভুলিলেই দুঃখ—কৃষ্ণকে স্মরণ রাখলে কিসের দুঃখ!

"সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

আর এক কথা—আমাদের সকল কর্ম্মেই "এতৎ কর্ম্ম ফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" বলার রীতি বহু যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং সে সকল কর্ম্ম বা ফল সঞ্চিত হইতে পায় নাই। তবে দুঃখ আসবে কি কোরে ?

তবে যে দুঃখ দৃষ্ট হয় সেটা খুন—জখম নয় সেটা গুরুর সংশোধন—চেষ্টা—মা বাপেরজুজু দেখান মাত্র—সুখেরই হেতু মাত্র। কৃষকের শস্যবপন—পাকা ফসল কর্ত্তন করারই জন্য, সে দুঃখটাও সুখ—গর্ভিনীর প্রসব বেদনা সেটাও সুখ পর্য্যায়-ভুক্ত—ছেলেদের রাত্ জেগে পড়া সেটাও সুখ—আর গৃহাভাবাদি সেটাও ভজন—অবসর দেওয়া সুখ মাত্র, যেটা অনেক সাধনায় ছাড়্তে হয়—সেটা আগে থেকে ছাড়িয়ে রাখা—নিশ্চয়ই সুখ জনক বটে।

অতএব আমরা দেখ্‌লাম এই জগতে যে গুলোকে আমরা দুঃখ মনে করি সেগুলো সুখেরই অগ্রদূত মাত্র—সুখ সৌধের সোপানাবলী উত্তরণিকা মাত্র। প্রকৃত পক্ষে দুঃখ—জগতে নাই—থাকিতে পারে না—কারণ "আনন্দাৎখলুইমানি ভূতানি জায়ন্তে" আনন্দেই জন্ম, আনন্দেই স্থিতি, আনন্দেই পর্য্যবসান। জগৎ দুঃখময় কারা নয়—ইহা সুখময় সাধনা ভূমি।

বাস্তবিকই কারাও যে বরণীয় তা বহু বহু মহাত্মার জীবনে পরিলক্ষিত হয় অতএব ভাই গণ—দুঃখ দুঃখ কো'রে অর্জ্জুনের মত বিষাদগ্রস্ত না হোয়ে সুখে দুখে, হানি লাভে, মানে অপমানে সম ভেবে—কৃষ্ণচরণে উন্মুখ হোয়ে আসুন আমরা আজ হোতে ভজন সুখে প্রবৃত্তহই—দুর্ল্লভ মানব জন্ম সুদুর্ল্লভ সাধু সঙ্গে সুখি করি। কেহ বলেন দুঃখটা না গোড়্‌লেই তো হোতে ? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পূর্ব্বেই ব'লেছি। "কৃষ্ণভুলি" সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব

মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ" সূর্য্যের পরিধি আলোময়—তার মধ্যে অন্ধকারের লেশও নাই। তবে অন্ধকার কি কোরে হয়—ছায়া কোথা থেকে আসে? ব্যবধানই তার কারণ। কৃষ্ণভুলাই এই ব্যবধান। সূর্য্যের পরধি জ্যোতির্ম্ময় হইলেও সেই সূর্য্য যখন আমাদের সম্মুখে তখনই আলোময় দিন, আর যখন সেই সূর্য্য ও আমাদের মধ্যে কোন যবনিকা উপস্থিত হয় তখন সূর্য্য আড়ালে পড়েন অমনি ছায়া—অমনি অন্ধকার দেখা দেয়। কৃষ্ণও সবখানে আনন্দ সুধায় গড়া, কিন্তু ঐ আমাদের বিস্মৃতিই তাঁকে আমাদের নয়ন-অঙ্গন হইতে অন্তরালে লইয়া যায়। অমনি মায়া—অমনি দুঃখ দেখা দেয়। কৃষ্ণকে স্মৃতি পটে রাখিতে পারিলে মায়া বা তজ্জনিত দুঃখ আদৌ থাকেনা। "সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥ এখন বুঝুন দুঃখ যখন থাকেনা, তখন দুঃখ গড়েছেন একথা বলা চলে না। যার মুখ কৃষ্ণের দিকে নয় সেই বল্‌বে—'দুঃখ গোড়েছেন'—কিন্তু যার নয়ন মন হরিপাদপদ্মে সমর্পিত সে বোল্‌তে পারবেনা যে—'দুঃখ গোড়েছেন'। তার সবটাতেই আনন্দ—সকল অবস্থাতেই সুখ। ব্রহ্ম-হরিদাসকে দেখুন, প্রহ্লাদকে দেখুন—তাঁদের কাছে দুঃখ নয়। প্রিয়তমের সেবা মাত্র।

এখন প্রশ্ন হোতে পারে এই যে, জীব কৃষ্ণভুলে—এটা কি কোরে হয়? জননী জঠরে ত কৃষ্ণ-স্মৃতি থাকে। জগতে পড়েই এমন তর বিস্মৃত হয় কেন? উত্তরে বলা হয় "ভুমিষ্ট হইতে মায়া জ্ঞান হরি নিল"। মায়া ত কৃষ্ণেরই অন্যতম শক্তি। তা হোলে এই জ্ঞানহরণটা কৃষ্ণেরই তৃতীয়া শক্তির অথবা কৃষ্ণেরই কাজ। হাঁ—তিনিই তাঁকে ভুলাইয়া দেন। না ভুলালে খেলা—লীলা হয় না। এ একরকম লুকোচুরি খেলা। কেলিপ্রিয় মাধব—খেলা ধুলা নিয়েই থাকেন। খেলাই তাঁর কাজ।

তিনি সর্ব্বত্রই রয়েছেন—"ব্যাপ্তং যেন চরাচরং"—কিন্তু লুকিয়ে আছেন। জীব জগতে এলো—পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় পাইল কিন্তু ইন্দ্রিয়ের যিনি অধিপতি সেই হৃষীকেশকে দেখিতে ধরিতে পারিলনা। ছায়ায় ভুলিয়া কায়াকে দেখিতে পাইল না। মায়ায় পোড়ে মায়াধীশকে হারাইয়া বসিল। কিন্তু জীব খুঁজছে—তাঁকেই খুঁজছে—সেই আনন্দই চাচ্ছে। ছেলেরা যেমন চোখ্ বাঁধে—তারপর সেই চোখ বাঁধা বালক একে ওকে ধরে কিন্তু আসল বস্তুকে সহজে ধরতে পারে না। ঠিক্ তেমনি জীব এতে ওতে আনন্দ খোঁজে। কোথাও না পেয়ে বলে— "খুলে দে মা চোখের ঠুলি দেখি শ্রীপদ মনের মত। মা আমায় ঘুরাবি কত?" তখন সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥" এই খেলা, একে দুঃখই বলুন আর যাই বলুন। যে শিশু চোর সাজে তার কি আনন্দ হয়না বোল্‌তে চান? এও সেই সাজা দুঃখ—প্রকৃত দুঃখ নয়। আমরা অসত্যেরে সত্য করি মানিয়া এই দুঃখের স্বপ্ন দেখি মাত্র, ঘুমটা ভাঙ্গিলেই আনন্দ বিস্মৃতিটা দূর হোলেই সুখ। এবার আমরা আর গোটাকতক দুঃখের দৃষ্টান্ত দিয়ে ও সেগুলিও যে দুঃখ নয়—তাই দেখিয়ে এই প্রবন্ধটি শেষ কোর্‌বো

১ম জরা, ২য় মরণ, ৩য় ব্যাধি, ৪র্থ বিপদ, ৫ম জন্ম ও ৬ষ্ঠ বাঞ্ছিত বস্তু না পাওয়া এই গুলি দেখা যাক্।

১ম জরা বা বৃদ্ধত্ব। উদ্ভিদ্ জগতেও অঙ্কুর উদ্গম হোতে আরম্ভ কোরে পক্কতা প্রাপ্তি আছে। প্রকৃতির যত যত সৃষ্টি সবই এই ক্রমপরিণতির অধীন! মানুষও প্রকৃতির সৃষ্টি—প্রাকৃত পদার্থ—প্রকৃতির এক অধ্যায়—তাই বৈষ্ণব দার্শনিক মানুষকে প্রকৃতি হোতে নিজকে প্রকৃতি ভাব্‌তে বোলেছেন—প্রকৃতি স্ত্রীলিঙ্গ—তাই বলা হয় 'একলা পুরুষ কৃষ্ণ আর সব নারী—অর্থাৎ নারী যেমন কর্ত্তৃত্তবিহীনা সেবিকা মাত্র, মানব ও

তেম্‌নি ভগবদ্ দাস মাত্র। যাক্ সে কথা—ঐ যে পক্কতা উহারই নামান্তর জরা। শিশুর এই ক্রমপরিণতি অনিবার্য্য—শিশু যদি চিরদিনই শিশু থাকে—তা হোলে শিশুত্বের উপলব্ধি থাকে কি? না যোয়ানের বা প্রৌঢ়ের বা বৃদ্ধের কাজ শিশুকে দিয়ে হয়? তাই শিশুত্ব সরে যায় যুবাত্ব আসে, যুবাত্ব চোলে যায় বৃদ্ধত্ব আসে। এবং পরস্পর বৈপরীত্য অনুভূতির মধ্য দিয়ে সব দশাগুলোই সম্যক্ অনুভবের বিষয় হয়; সুতরাং জরায় শত অসুবিধা-দুঃখ থেকেও ওটা দুঃখ নয়, সুখেরই চেহারা ভেদ মাত্র। যেমন বাচার সুখ চাইতে গেলে রোগচিকিৎসার দুঃখ, চাই, প্রাণ রাখিতে গেলেই প্রাণান্ত পরিশ্রম চাই,—ঠিক্ তেম্‌নি রোগ সারানটা দুঃখ হোয়েও যেন সুখার্থে কৃত—এই জরাও তদ্রূপ;—এতে দুঃখ থাক্‌লেও এটা সুখেরই উপাদান মাত্র। আবার শিশুত্ব বা যৌবন বা স্থবিরতা কোনটাই কেবল সুখ বা কেবল দুঃখ নয়। প্রত্যেক অবস্থায়ই কতকগুলো সুখ ও কতকগুলো দুঃখ আছেই আছে। সুতরাং একটাকে কেবল দুঃখময় বলা পর্য্যবেক্ষণের অভাব মাত্রই সূচিত করে।

২য় মরণ বা মৃত্যু—জীবের পক্ষে এটা গৃহত্যাগ—স্থানান্তর—বা শ্রীগীতার ভাষায় বাস ত্যাগ অর্থাৎ কাপড় ছাড়া মাত্র। সম্পূর্ণ বিনাশ নাই। কিছুদিন অদর্শন—পুনঃ দেহ ধারণ। বীজের মধ্যে বৃক্ষ অদর্শিত থাকে ক্ষিত্যপাদি যোগে দর্শন যোগ্য পাদপ বা লতিকা সঞ্জাত হয়। মানুষেরও তাই। বীর্য্যই মানুষ হয়। মানুষ দেহ ভস্ম বা মৃত্তিকায় পরিণত হয়। ভস্ম বা মৃত্তিকা থেকেই আবার তরু গুল্ম লতা জাত হয়। তা থেকে ফল মূল শস্য জন্মে। তা খেয়ে আবার সেই বীর্য্য—উৎপন্ন হয়। ঠিক্ যেন সমুদ্রের জল—সূর্য্যতাপে বাষ্প হয়। খুব উপরে উঠে সেই বাষ্প মেঘ হয়—বর্ষায় সেই মেঘে বৃষ্টি পড়ে—আবার সেই জলটা

গড়িয়ে গড়িয়ে সমুদ্রে যায়। ঐ মরণটাও ঐরূপ গড়িয়ে সাগরে মেশামাত্র। একান্ত অভাব নয়। যেখানে ছিল সেখানথেকে নড়ে বসা মাত্র। বর্ষা ফুরুলে পৃথিবী শুকনো খট্‌খটে। যেন জল নেই, কিন্তু আবার সরস হয়। জীবনান্ত্য প্রাণীকেও প্রাণহীন মনে হয় কিন্তু সময়ে আবার প্রাণ আসে। সে দেহে না হোতে পারে—দেহান্তরে আসে! প্রাণ একবারে শেষ হবার নয়। দম্ দিলেই ঘড়ি চলে—স্প্রীং ভাঙ্গে আবার স্প্রীং নূতন হয়।

যেখানে একগাছি তৃণ থাকে, সেখানে আর একগাছি কি হোতে পারে? সে গাছটি শুকিয়ে সেস্থানটি ছেড়ে দিলে সেইস্থানে আর একটি তৃণের অঙ্কুর ওঠে। জড় রাজ্যেও ঐ নিয়ম—আজ যেখানে শৈল কাল সেখানে সিন্ধু,—আজ যেখানে সাগর কাল সেখানে ভূধর,—আজ যেথায় নগর, কাল সেথায় অরণ্য—আজ যেথায় অরণ্য—কাল সেথায় জনপদ, একটি না সরিলে অন্যটি হয় না। যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী? রঘুপতেঃ ক গতা উত্তর কোশলা? রাবণের স্বর্ণ লঙ্কাপুরী—দুর্য্যোধনের ময়দানব বিরচিত মহাসভা—কোন্‌টি স্থায়ী—সার? সবই সঙ্‌সার—অসার—অস্থায়ী—তাই তার জন্য চেষ্টা—তাই তাতে সুখ।

স্থায়ী হোলে তার জন্যে চেষ্টা শ্রম চিন্তা থাকতো না সুখ—আনন্দও হোতো না। সেটা একঘেয়ে সুর—একটানা স্রোত—থোড় বড়ি খাড়ার মত সুশ্রাব্য—অকর্ম্মণ্য—ও বিস্বাদ হোয়ে পোড়্‌তো!

যারা দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ করে তারাই অভিভূত—শোক-কাতর হয়—কিন্তু যারা দেহীর সহিত সম্পর্ক পাতায় তাদের ঠোক্‌তে হয় না—কোন কাতরতাই প্রকাশ পায় না।

এখানে ও অনন্ত স্নেহ লক্ষিত হয়। শিশু যেমন দাড়ি কামানর জন্য

ব্যস্ত, অর্থাৎ যুবা হবার জন্য আগ্রহান্বিত, তার মা বাপও ছেলেটি যোয়ান হবে কবে, তার বে' হবে কবে, সে রোজগারী হবে কবে ইত্যাদি—উৎকণ্ঠায় পূর্ণ—শৈশব মিষ্ট হয়েও যৌবন অভাবে—প্রাগুক্ত উৎকণ্ঠায় অমিষ্ট। যুবা যেমন বিজ্ঞ—বৃদ্ধ না হোলে রক্ত-গরম ভাব ছাড়ে না গোঁয়ার তুমি, ছেলে মানুষী যায়না ক্রোধাদি শান্ত হয় না—সেজন্য সকলেই যুবাকে বৃদ্ধ দেখিতে চায়—ঠিক সেই রকম বৃদ্ধ আবার উন্নততর কোন অবস্থায় বা শিশুত্বে না গেলে চলেনা—তাই দেহান্তর। এটা শোকের দুর্ঘটনা নয়—বরং এই প্রকৃতি জাত মর্ত্ত্যদেহের নানা বন্ধন-বিশিষ্ট জীবদেহ হইতে পৃথক্ হওয়া—বিমুক্ত হওয়া, অশোক—অচিন্তার রাজ্যে যাওয়ায় স্বাধীনতার সুখ ও আনন্দ যথেষ্টই আছে।

৩য় দুঃখ ব্যাধি—নূতন—নবীভূত স্বাস্থ্য দিবার জন্যই আসে। কোন না কোন বিষ দেহে প্রবেশ করে। সেইটেকে বার কোরে দেবার জন্যই ব্যাধি। বি+আধি অর্থাৎ আধি যার দ্বারা বিগত হয়। সুতরাং এটা অভিসম্পাত নয় আশীর্ব্বাদ মাত্র—দয়া মাত্র। তাই কোন ব্যাধির নাম মার দয়া। পায়ে কাঁটা ফুটে থাকা ভালো—না—বেরিয়ে যাওয়া ভালো? বেরিয়ে গেলে কি শান্তি বোধ আসে না? ৪র্থ বিপদ—এর মধ্যে প্রিয় বিয়োগ এবং অপ্রিয় সংযোগও আছে। বিপদ সাধু—সজ্জন, সাধু বাটীতে এলে কেমন ভালো কথারই প্রসঙ্গ হয়—ভগবানেরই নাম গুণ যশোরূপের কীর্ত্তন হয় বিপদ বাড়ীতে এলে ও তাই। বজ্র-নির্ঘোষ না হোলে কেউ জয়রাম বলেনা। তাই কুন্তীদেবী বিপদকেই বরণ কোরেছিলেন। ভক্ত শ্রেষ্ঠ তুলসী দাস বোলেছেন—"সুখমে বাজ পড়ূ"।

৫ম—জন্ম। প্রহ্লাদ বোলেছেন "নাথ! যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং। তেষু তেস্বচলা ভক্তিঃ অচ্যুতেস্ত সদাত্বয়ি" যেখানে সেখানে

জন্মাই—ক্ষতিনাই, কিন্তু তোমাতে যেন অচলা ভক্তি বজায় থাকে। ভক্তি যদি রইলো জন্মাতে কোন আপত্তি নাই।

৬ষ্ঠ বাঞ্ছিত-অলাভ। আমার কি দরকার তাকি আমি জানি? তা যদি জান্তাম, বাঞ্ছিতের অপ্রাপ্তিতে দুঃখ হোতো। তা যখন জানি না, বাঞ্ছিত না পেলে বুঝতে হবে যে, বাঞ্ছিতটি যদি পেতাম, নিশ্চয়ই একটা গোলযোগে পোড়তাম। ছেলে অনেকেই চায়—কিন্তু ছেলে যদি ভাল হয় ভালই—আর যদি ছেলে—পীলে হয় তা হোলে কি কষ্ট—বলুনত? হিরণ্যকশিপু যা বর চাইলে—তাই পেলে—কিন্তু হোতে পেরেছিল কি অমর? আমার বাঞ্ছিত আমার ক্ষুদ্র স্বার্থ বিজড়িত, আর প্রভু যা'দেন সেটা জগদ্ধিতায় তার মধ্যে আমারও সুখ সুবিধা নিহিত আছে।

এই রূপে সূক্ষ্ম হিসেবে বুঝে নিলে জগতে কোন দুঃখই নাই বলিতে হয়। তাই ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন—

"জানামিধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশঃ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথাকরোমি॥
ধর্ম্মে মম যে প্রবৃত্তি সে ত মোর নয়!
অধর্ম্মেতে যে নিবৃত্তি সেও তব হয়!!
ওহে হৃষীকেশ! থাকি' হৃদি মাঝে তুমি।
যাহাতে নিযুক্ত কর, তাই করি আমি॥

না না প্রিয়ে! ত্যজ আজি বিমরিষ ভাব,
প্রেমের মূরতি তুমি আনন্দরূপিণী ;
পুণ্য এ প্রেমের বন্যা ভাসাবে অবনী
লভিলে সে প্রেম-স্বর্গ কি আর অভাব ?"

তখন, (যথা—চৈতন্য মঙ্গলে :—)

"হাসিয়া সুভাবে প্রভু 'আইস আইস' বলে,
পরম পিরিতি করি বসাইল কোলে।

(পরে) বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু অঙ্গে চন্দন লেপিল ;
অগুরু কস্তূরি গন্ধে তিলক করিল।
দিব্য মালতীর মালা দিল গোরা অঙ্গে,
শ্রীমুখে তাম্বুল তুলি দিল নানা রঙ্গে।
তবে মহাপ্রভু সে রসিক শিরোমণি,
বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করয়ে আপনি।
দীর্ঘকেশ কামের চাচর জিনি আভা,
কবরী বান্ধিল দিয়া মালতীর গাভা।
মেঘ বন্ধ হইল যেন চাঁদের কোলেতে ;
কিম্বা উগারিয়া গিলে না পারি বুঝিতে।
সুন্দর ললাটে দিল সিন্দুরের বিন্দু,
দিবাকর কোলে যেন করিয়াছে ইন্দু।
সিন্দুরের চৌদিকে চন্দন বিন্দু আর
শশি-কোলে সূর্য্য তারা ধায় দেখিবার।"
কুসুমের গুচ্ছ ওই সুন্দর সুরভি
ঝরিছে লাবণ্যরাশি প্রতি স্পন্দনেতে।

খচিত করিলে তারে মণিমাণিক্যেতে
কি স্বর্গ-সুষমা খেলে উজলি অটবি।
সাজাইয়া আপন প্রিয়ারে মনোসাধে
প্রেমে মাতোয়ারা গোরা নেহারে বদন ;
নিরখি না মিটে আশা, পুনঃ দরশন
অতৃপ্ত নয়নে মরি হেরিছে আনন্দে।
কেন হইবেক তৃপ্তি ? পরশে পতির,
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দীপ্তি লাবণ্য তাঁহার ;
চন্দ্রোদয়ে উচ্ছ্বসিত যথা পারাবার ;
হেরি গোরা মনচোরা আরও অধীর।
প্রেমের প্রমাণ ধীরে করে প্রকটন
"ত্রৈলোক্য, অদ্ভুত রূপ নিরখি বদন
অধর বান্ধুলী সাধে করয়ে চুম্বন ;
ক্ষণে ভুজলতা বেড়ি করে আলিঙ্গন।" (চৈঃ মঃ)
কেন হেন আচরণ ওগো ও ভাবক !
আজি কেন সচেতন হেরিগো তোমায় ?
চরমে বারেক সুখী করিবে প্রিয়ায় ?
চিত্তে সে রাখিবে আঁকি এই স্মৃতিসুখ।
ভেবেছ কি বিষাদের তিমিরে যে জন
ডুবে যাবে চিরতরে, শেষ একবার
সুখের সাগরে তাঁরে দেয়াবে সাঁতার,
তাই বুঝি ধরিয়াছ ধৈরজ এমন !
পার হেন করিতে হে ! পার তুমি সব,
ফুলসম কোমল, কঠিন বজ্রপ্রায়

মহাপুরুষের নাকি হৃদয় সদায়?
বৈরাগ্য চাপিয়া রাখা নহে অসম্ভব।

(তখন) আদরে সোহাগে বিষ্ণুপ্রিয়া বিধুমুখী
পতির উরসে রাখি বিধুমুখ সুখে
সুবর্ণ মৃণাল করে ধরি তাঁরে বুকে
গেল নিদ্রা, পাছে যেন দিতে নারে ফাঁকি।
হায়! এত আৰ্ত্তি আর সতর্কতা এত
সফল হইবে নাকি? যদি নাহি হয়,
উদ্দণ্ড করিবে নৃত্য কি চণ্ড প্রলয়!
কি বহ্নি জ্বলিয়া তাঁরে দহিবে সতত!

কিন্তু হায়!

কি হইল অকস্মাৎ বলিতে যে নারি রে
পৰ্ব্বত পড়িল তাঁর শিরে!
ঘুমন্ত বালার বুক বিচূর্ণীত করি রে
ভাষাইল দুঃখের পাথারে!
পাশ ফিরি গৌরহরি না হেরি হৃদয়ে রে
চমকিয়া জাগি বিষ্ণুপ্রিয়া
ত্বরিতে জ্বালিয়া বাতি ঘরে না নিরখি রে
শাশুড়ীর দ্বারে ধীরে গিয়া
বলে "মাগো সৰ্ব্বনাশ ভেঙ্গেছে কপাল গো
চলে গেছে বাহির হইয়া
উঠ মা! ডাকিয়া আন; তব কণ্ঠধ্বনি গো
শুনি পুনঃ আসিবে ফিরিয়া!"

যথা (প্রাচীন পদে)—

"হায় বিষ্ণুপ্রিয়া চমকি উঠিয়া
পালঙ্কে বুলায়ে হাত,
প্রভু না দেখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
শিরে মারে করাঘাত।
এ মোর প্রভুর সোণার নূপুর
গলার সোণার হার,
এ সব দেখিয়া মরিব ঝুরিয়া
জিতে না পারিব আর।
মুই অভাগিনী সকল রজনী
জাগিল প্রভুরে লৈয়া,
প্রেমেতে বান্ধিয়া মোরে নিদ্রা দিয়া
প্রভু গেল পলাইয়া;
কাঞ্চন নগর গেলা বিশ্বম্ভর
জীব উদ্ধারিবার তরে,
এ দাস লোচন দগদগি মন
শচী না পাইলা দেখিবারে।"

তখন (পুনঃ প্রাচীন পদে)—

"শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের পাশে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া
শয়ন মন্দিরে ছিলা নিশাভাগে কোথা গেলা
মোর মুণ্ডে বরজ পাড়িয়া!
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দুনয়নে,
শুনিয়া উঠিলা শচীমাতা;

আলু থালু কেশে ধায় বসন না রয় গায়,
শুনিয়া বধূর মুখের কথা।
ত্বরিতে জ্বালিয়ে বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ-সাথে কাঁদিতে কাঁদিতে পথে
ডাকে শচী 'নিমাঞি' বলিয়া ;
শুনিয়া নদীয়ার লোকে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে
যারে তারে পুছেন বারতা,
একজন পথে যায় দশ জন পুছে তায়
গৌরাঙ্গে দেখেছ যাইতে কোথা ?
সে বলে দেখেছি পথে কেহো ত নাহিক সাথে
কাঞ্চন নগর পথে ধায় ;
কহে বাসুঘোষ ভাষা শচীর এমন দশা,
পাছে জানি মস্তক মুড়ায়।"
যখন শুনিল শচী কাটোয়ার নাম রে
বুঝিল কি ঘটিবে কপালে।
কণ্টক নগরে আছে ভারতী সন্ন্যাসী রে
সে-ই বজ্র হানিবেক শিরে !
ভাবিতে পরাণ তাঁর উড়িল অমনি রে
অবশ সে দেহ ভূমে পড়ে !
ক্ষুদ্র বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ আত্ম সম্বরিয়া রে
রহিলেন শাশুড়ীরে ধ'রে।
শেষরাত্রে পথে মাত্র দুই অনাথিনী রে
লইয়া বধূরে শেষে ধীরে

আপনার বাসে আসি ভিতরে না পশি রে
রহিলেন বাহির দুয়ারে।
যথা (প্রাচীন পদে)—
পড়িয়া ধরণী তলে শোকে শচী কাঁদি বলে
লাগিল দারুণ বিধি বাঙ্কে,
অমূল্য রতন ছিল কোন বিধি হরি নিল
পরাণ পুতুলি গোরাচাঁদে।
অঙ্গের অঙ্গদ বালা গোরাচাঁদের কণ্ঠিমালা
খাট পাট সোণার ঝুলিচা।
সে সব রহিল পড়ি, গৌর মোরে গেল ছাড়ি!
ছট ফটি করে মোর হিয়া;
যোগিনী হইয়া যাব গৌরাঙ্গ যথায় পাব
কাঁদিব তাঁর গলায় ধরিয়া॥
যে মোরে গৌরাঙ্গ দিব বিনামূলে বিকাইব
হৈব তাঁর দাসের অনুদাসী,
বাসুদেব ঘোষ ভণে কাঁদে শচী কি কারণে?
জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী॥" (পদকল্পতরু)

চলিল নিমাই দুয়ারেতে আই
স্তম্ভিতার মত জ্ঞান বুদ্ধি নাই
কিবা যে হইল কিছু নাহি মনে
আপনার দশা আপনি না জানে
মেদিনীর প্রায় জননী হৈলা।
মুখে বাক্য নাই নিস্তব্ধা অচলা
পুত্তলিকা প্রায় বিষ্ণুপ্রিয়া বালা
"হায় নাথ" শুধু মুখেতে বোলা।

"কোথা গেলে নাথ! দাসীরে ছাড়িয়া
কোন দোষে দোষী বল বিষ্ণুপ্রিয়া?
যদি অপরাধী, মা ত দোষী নন;
তাঁহারে তাজিয়া কেন পলায়ন?
মাতৃভক্ত শিরোমণি যে তুমি।"
বধূর কাতর করুণ রোদন
করি শচীদেবী ধীরে আকর্ণন
কান্দিছে বিষাদে লুটিয়া ভূমি।
বহিতেছে রহি রহি সমীরণ
সেদিন উষার ভাবটি কেমন!
ক্বচিৎ বিহগী করিছে রোদন
আলো অন্ধকারে একত্র মিলন
উঠে হেনকালে আকুল ধ্বনি।
উষার নিশ্বাস মৃদু সমীরণ
প্রকৃতির এই করুণ ক্রন্দন
হৃদয়ে দ্বিগুণ ছাইল গ্লানি॥
পবন সহায়ে যথা হুতাসন
তেমনি বাড়িছে শোকের দাহন;
উত্তর উত্তর বাড়িছে ক্রন্দন
হায় কতবার ভূমে বিলুণ্ঠন;
যাতনা পরাণে আর না ধরে!
ভূমিতে লুটিয়া বুক ফাটাইয়া
হৃদয়ের তাপ বাহির করিয়া
সোয়াস্তি কে হায় পাইতে পারে?

প্রত্যুষেতে শুনি ক্রন্দনের ধ্বনি
যুটিলা আসিয়া পাড়ার রমণী
শচী সহচরী শ্রীবাস ঘরণী
সর্ব্বজয়া আর ছিরিও শর্ব্বাণী
বুঝিয়া ব্যাপার বিকলা সবে!
কোথা বা সান্ত্বনা করিবেন তাঁরা,
আপনা অপনি কাঁদিয়াই সারা,
পূরিল চৌদিক ক্রন্দন রবে!
নিশীতে নিমাই গিয়াছে চলিয়া,
সনাতন গৃহে এ ধ্বনি পশিয়া
ঘৃতের সংযোগে অনল যেমন
শোকাগুণ তীব্র জ্বলিল তেমন
সনাতন কাঁদে 'কি হল' বলি।
কাঁদে মহামায়া উন্মাদিনী প্রায়
বলি 'বিশ্বম্ভর কোথা গেল হায়
অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ারে ফেলি॥
যে যেখানে শুনে সে করে ক্রন্দন,
ক্রন্দন বিরতি হবে কি কখন?
সতত কাঁদিবে শচী মহামায়া,
সতত কাঁদিবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া;
কাঁদিবে ভরিয়া দিবস যামি।
কাঁদিবে রে সবে যত দিন রবে
তপ্ত অশ্রুধারা সতত ঝরিবে;
গৌরহরি! একি করিলে তুমি॥

*   *   *   *

হ'ল নিশী অবসান দুহার নাহিক জ্ঞান
রয়েছে পড়িয়ে মৃতবৎ ;
নদীয়ার ভক্তগণ যাঁরা নাহি জানে হেন,
আসিল সকলে পূর্ব্ববৎ।

যথা, পদকল্পতরু ধৃত প্রাচীন পদে :—

"সকল মহান্ত মেলি সকালে সিনান করি
আইলা গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি
শচী কান্দে বাহির দুয়ারে!
শচী কহে শুন মোর নিতাই গুণমণি!
কেবা আসি দিল মন্ত্র কে শিখাইল কোন্ তন্ত্র,
কিবা হৈল কিছুই না জানি।
গৃহ মাঝে শুইয়া ছিনু ভাল মন্দ না জানিনু
কিবা করি গেল রে ছাড়িয়া ?
কেবা নিঠুরাই কৈল পাথারে ভাসাঞা দিল
রহিব কাহার মুখ চাঞা ?
বাসুদেব ঘোষ ভাষা শচীর এমন দশা
মরা হেন রহিল পড়িয়া ;
শিরে করাঘাত মারি ঈশানে দেখায় ঠারি
গেলা গোরা নদীয়া ছাড়িয়া ॥"

ভূমে অভিভূতা পড়ি' শচী আই
ঠিক যেন মৃতা মুখে বাক্য নাই,
সেবক ঈশান কাঁদিছে শোকে ;

সমাগত ভক্ত ভীত উৎকণ্ঠিত
ইঙ্গিতে ঈশান বুঝাল বিহিত
নিমাই দিয়াছে কি শেল বুকে!
তখন—"কাঁদে সব ভক্তগণ হইয়া অচেতন
হরি হরি বলি উচ্চৈঃস্বরে,
কিবা মোর ধন জন কিবা মোর জীবন
প্রভু ছাড়ি গেল সবাকারে।
মাথায় দিয়া হাত বুকে মারে নির্ঘাত
হরি হরি! প্রভু বিশ্বম্ভর
সন্ন্যাস করিতে গেলা আমা সবা না বলিলা,
কান্দে ভক্ত ধূলায় ধূসর।
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি কান্দে মুকুন্দ, মুরারি
শ্রীধর, গদাধর, গঙ্গাদাস;
শ্রীবাসের গণ যত তাঁরা কান্দে অবিরত
শ্রীআচার্য্য কান্দে হরিদাস।
শুনিয়া ক্রন্দন রব নদীয়ার লোক সব
দেখিতে আইসে সব ধাঞা;
না দেখি প্রভুর মুখ সবে পায় মহাশোক
কান্দে সবে মাথে হাত দিয়া।"

(চৈতন্য ভাগবত)

"কতক্ষণে ভক্তগণ হই কিছু শান্ত।
শচীদেবী বেড়ি সব বসিলা মহান্ত।"

(ঐ)

সপ্তম সর্গ।

সন্ন্যাস

প্রভঞ্জন ভীমবেগে আলোড়ি আকাশ
গভীর গর্জ্জনে দলি পাদপ লতায়
ছুটিল, বিদ্যুৎ ঘন হইল বিকাশ ;
ঘোর মেঘমন্দ্র কিবা ! প্রলয়ের প্রায়
বাঁধিল প্রচণ্ড কাণ্ড ! ভূকম্পে ধরণী
উঠিল কাঁপিয়া, ভীত ত্রস্ত জনপ্রাণী।
না হইতে নিশাশেষ নদীয়ার শশী
নদীয়া আঁধার করি করিলা প্রস্থান।
না মুছিতে রজনীর অন্ধকার রাশি
গঙ্গাপার হ'য়ে চলে ভারতীর স্থান।
কেশব ভারতীন্যাসী কৃষ্ণনিষ্ঠ মন,
অভিপ্রায় তথা মন্ত্র করিতে গ্রহণ।
সোণার পুতুলি আসি পশিলা যখন
হ'ল চতুর্দ্দিক আলো রূপের প্রভায়,
স্বর্ণ-রশ্মি-জালে দীপ্ত হইল গগন,
সুপিঙ্গল বাষ্প যথা আকাশের গায়
বিধুনিত তুলাপ্রায় সমীরণ ভরে
কি লীলায় ইতস্ততঃ বিচরণ করে !

বিমুগ্ধ বিস্ময়ান্বিত হেরি জনগণ,
ভাবে এই রূপরাশি ছিলরে কোথায় !'
'কে এক দেবতা করিয়াছে আগমন'
এই ধ্বনি মুহূর্ত্তে উঠিল কাটোয়ায়।
ত্রিদিব বিজয়ী রূপ মণ্ডিত বদন
উনমত্ত সবে করিবারে দরশন !
ললিত লাবণ্য লীলা লহরে লহরে
ঝরিতেছে প্রতিঅঙ্গে দিক্ উজলিয়া ;
বিচলিত সকলে অপূর্ব্বরূপ হেরে
রূপোন্মাদে পড়ে অশ্রু কপোল বাহিয়া।

রূপে অপরূপ শক্তি রয়েছে অর্পিত
সর্ব্ব-চিত্ত আকর্ষিয়ে করে বিমোহিত,
বিহ্বল সকল—বাল বৃদ্ধ যুব নারী,
নিমাইকে প্রাণাধিক ভাবিতেছে মনে।
প্রীতি সবাকার হৃদে ভীমবেগ ধরি,
ভাসায়ে প্রখর স্রোতে লইতেছে টেনে।
বৃন্দাবন ধন হরি গেলে মথুরায়,
উঠেছিল তরঙ্গ কি এমতি তথায় ?
'কেন আসা ?' যবে সবে বুঝিল উদ্দেশ্য,
কি দারুণ ত্রাসে চিত্ত হইল চঞ্চল !
নারিবে হেরিতে হায় সন্ন্যাসের দৃশ্য ;
ভাবিতে সবার মন হইল বিকল।
সবেই ভাবিল আপনার কেহ যেন
দলিয়া হৃদয় চলি যাইবে এখন।

হেথা নবদ্বীপে শচীদেবীরে ঘেরিয়া
সকল মহান্ত ধৈর্য্য ধরি কতক্ষণে
ফিরাইতে বিশ্বম্ভরে কল্পনা করিয়া
ছুটিলেন কাটোয়ায় ভারতী সদনে।

নিত্যানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ গদাধর
ব্রহ্মানন্দ গেলা আর শ্রীচন্দ্রশেখর।
কৃষ্ণপ্রেমে উনমত্ত গৌরাঙ্গ ঈশ্বর
কৃষ্ণনাম রসে আছে আত্ম বিসরিয়া ;
ঊর্দ্ধনেত্রে ঝরে ধারা ; ঊর্দ্ধ দুই কর,
নাচিতেছে চক্রবৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
সোণার পুতুলি যেন যন্ত্রের চালিত ;
বিস্ময়ে সকলে হেরি হইল স্তম্ভিত।

না হবে বিস্ময় কেন কি কম্পে শরীর
কাঁপিতেছে ;—অস্থি সন্ধি ছিন্ন হবে যেন !
কি অশ্রু পতন ! জলযন্ত্রে যেন নীর
বর্ষিতেছে অবিরত ; মূর্চ্ছা ক্ষণে ক্ষণ !
"ক্ষণে কম্প ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়,
আছাড় দেখিয়া সর্ব্বলোক ভয় পায়।"
অকথ্য অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে
তাহা না কহিতে পারে অনন্ত বদনে,
পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল,
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল।
সর্ব্বলোক তিতিল প্রভুর প্রেমজলে
স্ত্রী-পুরুষ সবিস্ময়ে হরি হরি বলে।" (চৈতন্য ভাগবত)

হেন কাণ্ড কাটোয়ায় যখন
ভক্ত সব নদীয়ার পশিয়া তথায়,
তৃষিত নয়নে সবে করে দরশন—
নাচিছে সোণার মূর্ত্তি মাতালের প্রায়।
তুলি বহুক্ষণে মুখ, চাহিলা ঈশ্বর ;
কহিলা সুধীরে, কিবা গদগদ স্বর!
আসিয়াছ সবে যদি, কর গো করুণা,
কৃষ্ণপদ পাইবারে দেহ যোগ্য করি ;
করিও না মানা, সবে পূরাও বাসনা ;
করুণায় সবাকার পাইব শ্রীহরি।
"ভক্ত-কৃপা বিনা কোন কার্য্য নাহি হয়,"
ভকত কৃপায় হরি চরণ মিলয়।

যথা প্রাচীন পদে—

কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর
সুরধুনী তীরে তরু ছায়া যে সুন্দর।
তার তলে বসিয়াছেন গৌরাঙ্গ সুন্দর,
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্ত কলেবর,
নগরের লোক ধায় যুবক যুবতী,
সতী ছাড়ে নিজপতি জপ ছাড়ে যতি।
কাঁকে কুম্ভ করি নারী দাঁড়াইয়া রয় ;
চলিতে না পারে সেই নড়ি হাতে ধায়।
কেহ বলে হেন নাগর কোন্ দেশে ছিল,
সে দেশের পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল।
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া,
কেহ বলে মা বাপেরে আসিছে বধিয়া।

কেহ বলে ধন্য মাতা ধ'রেছিল গর্ভে,
দেবকী সমান যেন শুনিয়াছি পূর্ব্বে।
কেহ বলে কোন্ নারী পেয়েছিল পতি,
ত্রৈলোক্যে তাহার সমান নাহি ভাগ্যবতী।
কেহ বলে ফিরে যাও আপন আবাসে,
সন্ন্যাসী না হও বাছা না মূড়াও কেশে।
প্রভু বলে আশীর্ব্বাদ কর পিতামাতা,
সাধ—কৃষ্ণপদে বেচিব মোর মাথা।
হেন কালে কেশব ভারতী মহামতি,
দেখিয়া তাঁহারে প্রভু করিলা প্রণতি ;
'কৃষ্ণদাস কর গোসাঞি! দাও ভক্তি বর',
বাসুঘোষ কহে মুণ্ডে পড়ুক বজর।" (গৌঃ পঃ তঃ)

ভারতীর চিত হ'ল বিগলিত
অসম্মত মন্ত্র দিতে হইলা তখন।
কাঁদিয়া নিমাই বলে করযোড়ে,
পরিত্রাণোপায় হায় হইবে কখন ?

"এ বোল শুনিয়া কহে ভারতী গোসাঞী,
সন্ন্যাস দিব রে তোরে শুন রে নিমাই।
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ উল্লাস ;
নাপিত ডাকাইল শেষে মুড়াইতে কেশ।" (গৌঃ পঃ তঃ)

আসিল নাপিত, গোরা অনুনয় করি
মুড়াইতে শির তারে বলে বারে বার।
সে কুঞ্চিত চারু কেশ সর্ব্বচিত্ত হারি
ফেলিতে কে হেন পশু করে অঙ্গীকার ?

অক্ষম নাপিত; গোরা দিলা তারে বর,
বরেতে শকতি লভে সে নরসুন্দর।

"তখনে নাপিত আসি প্রভুর সন্মুখে বসি
ক্ষুর দিল সে চাঁচর কেশে;
করি অতি উচ্চ রব কান্দে যত লোক সব
নয়নের জলে দেহ ভাসে।
হরি হরি! কি না হৈল কাঞ্চন নগরে!
যতেক নগরবাসী দিবসে দেখয়ে নিশি
প্রবেশিল শোকের সাগরে।
মুণ্ডন করিতে কেশ হৈয়া অতি প্রেমাবেশ
নাপিত কাঁদয়ে উচ্চরায়।
'কি হৈল কি হৈল' বলে হাতে ক্ষুর নাহি চলে
'প্রাণ মোর বিদরিয়া যায়!'
মহা উচ্চরোল করি কাঁদে কুলবতী নারী
সবাই প্রভুর মুখ চাঞা,
ধৈরজ ধরিতে নারে নয়ন যুগল ঝরে
ধারা বহে নয়ন বহিয়া।
দেখি কেশ অন্তর্দ্ধান অন্তরে দগধে প্রাণ
কাঁদিছেন অবধূত রায়;
রসিকানন্দের প্রাণ শোকানলে আন্‌চান্
এ দুঃখ ত সহন না যায়।" (পঃ কঃ তঃ)

দিয়া সন্ন্যাসীর বেশ গৌরাঙ্গ সুন্দরে
"হায় কি করিনু" বলি কান্দেন ভারতী।
সম্বরিয়া শোক পরে উচ্চারয়ে ধীরে
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম অনুপম অতি।